অনীক

জুন ২০১৪
বর্ষ ৫০ □ সংখ্যা ১২
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় □ ১

ঘটনাপ্রবাহ
ব্রাজিল, ফুটবল ও জনবিক্ষোভ □ সুচরিতা সেন □ ২
তুমি আমার লোক... □ তড়িৎ চৌধুরি □ ৪

প্রবন্ধ
হিন্দমোটরে সাসপেনশন... □ আভাষ মুন্সী □ ৫
মোদির ভারতবর্ষ □ রতন খাসনবিশ □ ২৮

নির্বাচন ২০১৪
যোড়শ লোকসভা নির্বাচন □ অরিজিৎ □ ৭
সংসদীয় নির্বাচন ও গণতন্ত্র □ পার্থ সারথি □ ১৫
গুজরাট মডেল □ সুমন কল্যাণ মৌলিক □ ১৯
জনসংঘ থেকে বিজেপি □ সমরেশ মিত্র □ ২৩

স্মরণ
সুনীতি কুমার ঘোষ □ শুভাশিস মুখোপাধ্যায় □ ৩১
অমলেন্দু দে □ সুস্নাত দাশ □ ৩৪
নির্মলদাকে নিয়ে কথা... □ শুভেন্দু দাশগুপ্ত □ ৩৭

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com
কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)
সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

মমতা আপনার দিন গিয়াছে। আট বছর আগে সিঙ্গুর আন্দোলনের সেই লড়াকু জননেত্রীর মহিমা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। নন্দীগ্রামের সংগ্রাম পর্বে, মমতা নামে উদ্বেলিত জনতা আজ এত নিস্পৃহ কেন? দিল্লীর রামলীলা ময়দানের কথা হইতেছে না, বঙ্গেও দেখিতেছি আপনার কোনো কোনো সভায় আশানুরূপ জনসমাগম না দেখিয়া উষ্মা প্রকাশ করিতেছেন। সাম্প্রতিক যে লোকসভা নির্বাচন হইয়া গেল, তাহাতে পশ্চিমবাংলায় আপনার দলের জয়জয়কার, ৩৪টি আসন পাইয়া লোকসভায় তৃতীয় বৃহত্তম দল। কিন্তু ভালো করিয়া বিজয়োৎসব করিতে পারিলেন না। কেন? উৎসবের ব্যাপারে আপনার বিন্দুমাত্র অনীহা আছে, এমন ভাবনা তো আপনার পরম নিন্দুকও মনে স্থান দেয়না। তবে? আপনার মনে কী ভয় ঢুকিয়াছে? মনে হইতেছে কী, মমতা নামের মোহ সর্বত্র কাজ করিতেছে না?

জনগণের আর দোষ কী? তাহাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয় নাই, শ্রবণশক্তিও নয়। সবই তাহারা দেখিতেছে, শুনিতেছে। তাহারা পরিবর্তন চাহিয়াছিল। পরিবর্তন হইয়াছে। সিপিএম-এর ক্যাডার বাহিনীর পরিবর্তে তৃণমূলের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী, তপন-শুকুর-মজিদ মাস্টারের পরিবর্তে অনুব্রত-আরাবুল-মনিরুল। আগে যাহারা ছিল 'দলের সম্পদ', এখন তাহারা 'সোনার ছেলে'। মমতা দেবী, আপনার যদি জনসমর্থন থাকে, তাহা হইলে নির্বাচনে ইহাদের প্রয়োজন হইল কেন? আমরা যাহারা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা, তাহারা মানিয়া লইয়াছি রিগিং নির্বাচনের পার্ট অব দি গেম। কংগ্রেস করিয়াছে, সিপিএম করিয়াছে, তৃণমূলও করিবে— ইহাতে আর আশ্চর্য কী। কিন্তু দীপালী সাহা, ঊষারাণী মণ্ডলরা বিধায়ক হইয়া যাহা করিয়াছেন, এযাবৎকাল পশ্চিমবঙ্গে কোনো বিধায়ক তাহা করেন নাই। সে যাহা হউক, প্রমাণিত হইল, গ্রামাঞ্চলেও ভোট আপনাকে কাড়িয়া লইতে হয়।

হিসাব যাহা দেখিতেছি, ২০১১ সালে বিরোধী দল হিসাবে জিতিয়া আসিয়াছিলেন, এমন অন্তত ২২টি বিধানসভা কেন্দ্রে আপনার দল দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সারিতে, যখন আপনার দল তিন বছরের বেশি রাজ্যে ক্ষমতায় আসীন। পাহাড়ের হাসি কী আপনি আর দেখিতে পাইতেছেন? জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়াই চলিতেছে, বেকার যুবকেরা চাকরির আশায় হা-পিত্যেশ করিয়া বসিয়া আছে, মহিলারা নিরাপত্তার অভাবে ভুগিতেছে, স্কুল-কলেজে তাণ্ডব চলিতেছে আর 'সিন্ডিকেট'-এর দখল লইয়া খুনোখুনি। আর আপনি তর্জন-গর্জন করিয়া সবাইকে বুঝাইতে চাহিতেছেন, "সব ঝুট হ্যায়" এবং সর্বত্র চাটুকার পুষিতেছেন। মানুষের ক্ষোভ বাড়িতেছে, ইহাতে আপনার উদ্বেগ নাই। ভোট কমিতেছে বলিয়া আপনার ললাটচর্ম কুঞ্চিত হইয়াছে।

মানুষের অধিকার, দাবির প্রতি দৃকপাত করুন। বামফ্রন্টের সহিত সৌহার্দ্য করিয়া লাভ নাই। লড়াই-সংগ্রাম হইতে অবসর লইয়া উহারা ডুবিয়াছে। আপনাকেও মূল্য চুকাইতে হইবে।

ঘটনাপ্রবাহ

ব্রাজিল, ফুটবল ও জনবিক্ষোভ

কয়েক বছর আগের ব্রাজিল ভ্রমণের স্মৃতি মনে পড়ছে। ঐ বিরাট দেশে দুইটি বস্তুর চর্চা, দুইটি বস্তু নিয়ে প্রবল আবেগ ও উত্তেজনা দেখেছিলাম— রাজনীতি ও ফুটবল। মনে আছে, রাজধানীতে ফুটবলের মিউজিয়াম বা যাদুঘর দেখেছিলাম। ব্রাজিল বোধহয় বিশ্বের একমাত্র দেশ যা ফুটবল মিউজিয়ামের গর্ব করতে পারে। বিশ্ব ফুটবলকে ব্রাজিল উপহার দিয়েছে পেলে, গ্যারিঞ্চা, রোনাল্ডোর মতো উজ্জ্বল তারকা। এয়ারপোর্ট বা রেলস্টেশনে সর্বত্র দেখেছি, ছোট পর্দায় ফুটবল ম্যাচ দেখানো হচ্ছে। সামনে ভিড়, তাদের যেন মরণ-বাঁচন উত্তেজনা। অথচ হয়ত এমন কোনো বড় ম্যাচ নয়। স্থানীয় দুই ক্লাবের মধ্যে প্রতিযোগিতা।

ব্রাজিলে ফুটবল কোনো খেলা নয়, বিনোদন নয়। জীবনধারা। জাতির, মানুষের এক আদর্শ। সেই ফুটবল সম্বন্ধেই ব্রাজিলে তীব্র বিরাগ সত্যিই বিস্ময়কর। না, বিরাগ ঠিক ফুটবলের প্রতি নয়। এই খেলাটিকে সেদেশের মানুষ এখনো প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। রাগ, বিরক্তি জমে উঠেছে ফুটবলকে কেন্দ্র করে আদিখ্যেতা, সরকারি অর্থের অপচয়, এমনকি দুর্নীতি নিয়ে। আমাদের দেশে যেমন কয়েক বছর আগে কমনওয়েল্থ গেম্স নিয়ে কেলেংকারি হয়েছিল। এটা গত নির্বাচনে শাসকদলের বিরাট বিপর্যয়ের অন্তত একটি কারণ। ব্রাজিলের মানুষের ক্ষোভ— যে পরিমাণ টাকা বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠানের পেছনে খরচ হয়েছে, তার অর্ধেকও জনকল্যাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ইত্যাদি বাবদ ব্যয় করা হয় না। ১০ মে ২০১৪, ব্রাজিলের এক শিল্পী, পাওলো ইতো, একটি স্কুলের দরজার ওপর একটি ছবি এঁকেছেন। একটি ছেলে খাবার টেবিলে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছে। সামনে প্লেটের ওপর কেবল একটা ফুটবল! (চিত্র) কিন্তু ফুটবল যতই প্রিয় হোক, তাতে পেট ভরে না। ব্রাজিলবাসীর একাংশের মতে, এ যেন জ্বলন্ত রোমে নিরোর বেহালা বাজানো।

গত বছর বিশ্বকাপের প্রস্তুতি রূপে কনফেডারেশন কাপ খেলা হয়েছিল ব্রাজিলে। তখনও এ জাতীয় অভিযোগ উঠেছিল। সরকার ঘোষণা করেছিল, ‘‘ফিফার উপযুক্ত মানদণ্ড অনুসারে স্টেডিয়াম তৈরি করতে হবে।’’ বিপরীত দিক থেকে দাবি উঠেছিল, ‘‘ফিফার মানদণ্ড অনুসারে স্কুল ও হাসপাতাল তৈরি করতে হবে।’’ এবারেও চোখে পড়েছে অনুরূপ দাবি, অভিযোগ। অত্যধিক খরচের অভিযোগ। সাংবাদিক জিরিন তাঁর Dance of the Devil বইয়ে দেখিয়েছেন, এবার বিশ্বকাপ বাবদ ব্রাজিল খরচ করছে ১৫০০ কোটি ডলার। বিগত তিনটি বিশ্বকাপে যা খরচা হয়েছিল এটি তার থেকে বেশি। অথচ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন ইত্যাদি খাতে অর্থ বাড়ন্ত। জিরিন বলেছেন, বিশ্বকাপের সঙ্গে জড়িত আছে তিনটি D। Debt, Displacement, Defence। ঋণ, বিস্থাপন, প্রতিরক্ষা।

সারা ব্রাজিল জুড়ে বিশ্বকাপের দায় মেটাতে কয়েক লাখ মানুষ উৎখাত হয়েছে বা হবে। ১,৫০,০০০ রক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। হয়ত বিশাল জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই রক্ষী দরকার। কিন্তু নিন্দুকেরা বলছে অন্য কথা। মহানগরের দুঃখ-দারিদ্র্য-বিক্ষোভ বিদেশি পর্যটকদের চোখের আড়াল করাই এর উদ্দেশ্য। বিশ্বকাপের অজুহাতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

ব্রাজিলের সরকার অবশ্য বলছে, বিশ্বকাপের অকুস্থল হওয়ায় দেশ যে পরিমাণে প্রচারের আলোয় আসছে, তা বাণিজ্য ও পর্যটনের পক্ষে সহায়ক হবে। যে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে তা নাকি পরেও কাজে লাগবে। কিন্তু এ ব্যাপারে অনেকেই সন্দিহান। এক সাংবাদিকের মন্তব্য, ‘‘ব্রাজিলের করদাতারা সারা পৃথিবীর ফুটবল-ফ্যানদের অনুদান দিচ্ছে।’’

ধরা যাক, ব্রাসিলিয়াতে নতুন তৈরি স্টেডিয়াম, যেখানে ৭৩ হাজার দর্শক স্থান পেতে পারে। অন্য কোনো বিশ্বকাপে এত বড় স্টেডিয়াম হয়নি। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরে এটা কোন্ কাজে লাগবে? ব্রাজিলের প্রাক্তন বিশ্বকাপ জয়ী প্রখ্যাত রোমারিও পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন, ‘‘যেখানে হাসপাতালে যথেষ্ট শয্যা নেই, অনেক রোগী মাটিতে শুয়ে, স্কুলে ছাত্রদের দুপুরের খাদ্যের অভাব, তখন এমন অপচয় অন্যায়। ফিফা ব্রাজিলের মানুষের ঘাড় ভেঙে খাচ্ছে।’’

ব্রাজিল বিক্ষোভের দিনপঞ্জি

শুরুটা হয়েছিল এক বছর আগে, এই জুন মাসে। ফুটবল দুনিয়ার অন্যতম বৃহৎ এক আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট, কনফেডারেশন কাপ শুরু হতে আর দিন কয়েক মাত্র বাকি। ব্রাজিলের সাও পাওলো শহরে বাস এবং মেট্রো ভাড়া ০.২০ রিয়াল (ভারতীয় মুদ্রায় মোটামুটি ৫.৩৬ টাকা) বৃদ্ধির প্রতিবাদে নাগরিকরা পথে নামে। তারপর এই বিক্ষোভ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে শহর থেকে শহরে। রাজধানী রিও-ডি-জেনিরোতে লক্ষাধিক মানুষ বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে। বিক্ষোভ শুধু বর্ধিত পরিবহন ভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে সীমাবদ্ধ থাকেনা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি জনপরিষেবার অপ্রতুলতা এবং ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ঘনীভূত অসন্তোষ বিক্ষোভের রূপ নেয়। প্রশ্ন উঠেছে, সাধারণ জনপরিষেবা খাতে ব্যয় কমিয়ে কেন ব্রাজিল অকল্পনীয় ব্যয়ে একের পর এক আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত করে চলেছে— কনফেডারেশন কাপ (২০১৩), বিশ্বকাপ (২০১৪), অলিম্পিক (২০১৬)। কনফেডারেশন ও বিশ্বকাপের জন্য ব্রাজিল সরকারের বরাদ্দ ১৫০০ কোটি ডলার, অলিম্পিকের জন্য ১৪০০ কোটি ডলার।

ব্রাজিল জুড়ে যে গণবিক্ষোভ দানা বেঁধেছে, ছড়িয়ে পড়েছে, সেটা বহুমাত্রিক। দুর্নীতি, প্রশাসনিক অব্যবস্থার সঙ্গে যোগ করা যায় অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি এবং এই সব কিছুর সম্মিলিত চাপে ক্রমশ গরিব হতে থাকা নাগরিকদের সুপরিকল্পিত ভাবে শহর থেকে উচ্ছেদ হতে থাকার রোজনামচা। এই সময় যে তথ্যটা দেওয়া জরুরি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা নগরায়িত হয়েছে যে সব দেশ— ব্রাজিল তাদের মধ্যে প্রথম স্থানে। এই দেশের ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জন শহরবাসী। অর্থাৎ, গত পঞ্চাশ বছর ধরে গ্রাম থেকে ঠাঁইনাড়া করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শহরে এনে ফেলা হল, গ্রামকে শহর করে দেওয়া হল। বলা হল এটাই প্রগতি। এখন এর উল্টো যাত্রা শুরু হয়েছে। বড় শহর থেকে উচ্ছেদ হয়ে অপেক্ষাকৃত ছোটো শহর আর ছোটো শহর থেকে উচ্ছেদ হয়ে গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষদের।

—বলছেন সাংবাদিক লুইস গোমেজ (*এই সময়*, ৮ জুন ২০১৪)।

স্টেডিয়াম এবং অন্যান্য নির্মাণ কাজের জন্য হাজার হাজার পরিবারকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে। যে সমস্ত স্থানে খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে এবং পর্যটকদের আগমন হবে, সেখানকার অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের শ্রমিকদের উৎখাত করে, তাদের রুজি-রোজগারের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে জায়গা পেয়েছে ফিফা অনুমোদিত ব্যবসায়ীরা। যে সমস্ত পরিষেবা থেকে প্রাইভেট কোম্পানিগুলো মুনাফা করবে, সেই সকল পরিষেবা নির্মাণ ও সংস্কার খাতে সরকারি অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। এই যে উন্নয়ন, এটা ব্যতিক্রমী নয়, বরং সার্বিক প্রবণতার অঙ্গ। ব্রাজিলের প্রান্তিক এবং নিপীড়িত শ্রেণী এই মডেলের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চালাচ্ছে।... মারাদোনা একদা বলেছিলেন— বলে দাগ লেগেছে। (মারিয়ানা আসিস, পাবলিক সেমিনার, ১০ জুন ২০১৪)।

পিউ রিসার্চ সেন্টার-এর সমীক্ষা কতকগুলি তথ্য পেশ করেছে—

ক) ব্রাজিলে বর্তমানে যা চলছে, তাতে ৭২ শতাংশ ব্রাজিলবাসী অসন্তুষ্ট।

খ) ৬৭ শতাংশের অভিমত ব্রাজিলের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ, ৩২ শতাংশের মতে ভালো।

গ) ৬১ শতাংশের বক্তব্য, বিশ্বকাপ অনুষ্ঠান ব্রাজিলের পক্ষে মন্দ, কারণ এই অনুষ্ঠান শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য জনপরিষেবা খাতের অর্থ টেনে নিচ্ছে। ৩৪ শতাংশ বলছে, ১৯৫০-এর পর ব্রাজিলের বুকে এই বিশ্বকাপ অনুষ্ঠান ব্রাজিলের ১২টি শহরে, যেখানে খেলাগুলি হবে, ৩৫ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং আরো কাজ সৃষ্টি করে অর্থনীতির উপকার করবে।

ঘ) ৮৫ শতাংশের মতে মূল্যবৃদ্ধি দেশের প্রধান সমস্যা, ৭২ শতাংশের মতে বেকারি।

ঙ) প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেফ সম্পর্কে ৫২ শতাংশ নেতিবাচক মন্তব্য করেছে, সমর্থন জানিয়েছে ৪৮ শতাংশ। প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে মনোভাবে সামাজিক বিভাজন বেশ স্পষ্ট। নিম্ন আয় এবং নিম্ন/প্রাথমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের অধিকাংশ প্রেসিডেন্টের পক্ষে, অনুপাতটি যথাক্রমে ৫৮ ও ৫৬ শতাংশ। অপরদিকে উচ্চ মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব শিক্ষিতদের ৭০ শতাংশ এবং উচ্চ আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের ৬১ শতাংশ প্রেসিডেন্টের বিপক্ষে।

চ) ৪৭ শতাংশ প্রতিবাদের সপক্ষে কারণ তারা মনে করে ব্রাজিলের সমস্যাগুলি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ৪৮ শতাংশ প্রতিবাদ চালানোর বিরুদ্ধে। তাদের অভিমত, এর ফলে বিশ্বের দরবারে ব্রাজিলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে।

ব্রাজিলের মতো দেশে এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। সেখানে আছে গর্ব করার মতো সংগ্রাম ও র‍্যাডিকাল ধারার ঐতিহ্য। ক্ষমতায় কিংবদন্তী শ্রমিক নেতা লুলার দল। একটি জনপ্রিয়, জনদরদি মডারেট বাম সরকার। বর্তমান প্রেসিডেন্ট দিলমা এক বীরাঙ্গনা। সামরিক শাসনের যুগে তিনি গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়ে নির্যাতিতা হয়েছিলেন। লাতিন আমেরিকার প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফ্রন্টের এক সদস্য ব্রাজিল। কলঙ্কিত চাঁদের মতো গৌরবজনক কিন্তু বিতর্কিত বিশ্বকাপের ছায়া সরিয়ে ব্রাজিল আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, এটাই আশা করা যাক।

সুচরিতা সেন

তুমি আমার লোক, তোমার ভালো হোক

নির্বাচনের মহাযুদ্ধ এবারের মতো শেষ, এবার শিবির গোছানোর পালা। এরাজ্যের জন-মানসিকতায় সারদার অর্থ কেলেংকারিতে এ রাজ্যের শাসকদলের জড়িত থাকার ঘটনা বিশেষ নাড়া দিতে না পারায় এবং 'পুলিশ যার ঘর তার' এই ফর্মুলায় শাসক দল খেলতে নামায়, খেলার ফলাফল একেবারেই একপেশে হয়ে যায়। তবু জোড়াফুলে কাঁটা জন্মেছে, তৈরি হচ্ছে কেন্দ্রের শাসকদলের অনুসারী বাহিনী, এরাজ্যে বামেদের মেরুদণ্ডহীনতার সুযোগ নিতে এগিয়ে আসছে গেরুয়া বাহিনী। ওদিকে নেত্রী পথ নিয়েছেন ''জো হুজুর'' বাহিনী তৈরী করার। যদিও তৃণমূল স্তরেই ছিল খয়ের খাঁ স্তাবক দল, কিন্তু শিল্পী-বুদ্ধিজীবী-খেলোয়াড়-অভিনেতা অভিনেত্রীদেরও একটি দল চাই। এরাই নেত্রীর নামগান-কীর্তনীয়া হবেন। তাই নেত্রীর মঞ্চে দেখা গেল একগাদা কবি-তারকাদের। মূলে ছিলেন এক সদ্য সাংসদ, যাকে আবার সারদা তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদ করা চলছে।

২০১১ সালে রাজ্য নির্বাচনের আগে 'সুশীল সমাজ' নামধারী বুদ্ধিজীবীর দল রাজ্যে পরিবর্তন চেয়ে প্রচার চালিয়ে জনমানসে ঢেউ তুলেছিলেন এবং তার পুরো ফায়দা নিয়েছিলেন দলনেত্রী। ভোটপর্ব চুকলেই সাথে সাথে নির্বাচিত সুশীল বুদ্ধিজীবী-অভিনেতা-তারকারা যোগ্য পুরস্কার পেয়েছেন। গত তিন বছর ধরে এরাজ্যে একের পর এক নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, দলীয় সন্ত্রাস, শিক্ষাক্ষেত্রে দলীয় বাহিনীর তাণ্ডব ঘটলেও এই পুরস্কৃতরা নীরবতাই শ্রেয় মনে করেছেন।

লোকসভা নির্বাচনের সময় দলনেত্রী একঝাঁক রূপোলী পর্দার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রার্থী নির্বাচন করেছেন। ভোটে অবাধ রিগিং বা দলীয় সন্ত্রাস তো ছিলই, এবারের যাত্রায় বাড়তি পাওনা ছিল নামীদামি অভিনেতা-অভিনেত্রী। নির্বাচিত সাংসদরা নিজ এলাকায় সময় দিতে গেলেই প্রাক্তন সাংসদ কবীর সুমনের মতো অবস্থা হবে জেনেই হয়তো বিজ্ঞাপনের মুখ হয়েই থাকবেন। সার কথা, যতক্ষণ তুমি আমার নামগান গাইছো ততক্ষণ তুমি পুরস্কৃত হবে। অন্যথায় তোমার অবস্থা 'কুনাল ঘোষে'র মতো হবে। তাই চাই বিবেকবোধহীন এক নতুন শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যাঁরা সবসময়ই বলবেন দিদিই সত্য, জগৎ মিথ্যা। আর এই পুরস্কারের জন্য বাছা হলো তাদেরও, যারা দিদি-ঝড় দেখে টালমাটাল বাম শিবির ছেড়ে দিদির আশ্রয় বেছে নিয়েছেন।

দিদি বলেছেন, 'সব নীল হো যায়গা'। পার্ক-ময়দান-রাস্তা-রেলিং-দেওয়াল-বাড়ি-ঘর সব নীল হতে শুরু করেছে। নীল রঙে বাড়ি ছোপালে খাজনা মাফ। সম্প্রতি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির চেয়ারম্যান, সরকারি প্রতিনিধি ইত্যাদি পদগুলিতেও নীল-এর ছোপ লাগতে শুরু করেছে। এইরকম এক নীল-কণ্ঠে বাণী শোনা গেল, 'সমালোচনা করে যে, দেশদ্রোহী হয় সে। যারা প্রশ্ন তোলেন, তারা কিছু পাননি বলেই প্রশ্ন তোলেন। বিরোধিতা একটা ব্যবসা'। বক্তা আগে ছিলেন লাল-কণ্ঠ, হয়েছেন নীল-কণ্ঠ।

অতএব জানা গেল, প্রশ্ন করলেই 'চক্রান্তকারী', 'দেশদ্রোহী' তকমা সেঁটে দেওয়া হবে। কিন্তু ২০১১ সালের ভোটের আগের প্রতিশ্রুতি দিদি ভুলে গেলেও, যারা ভোলেননি, তারা তো প্রশ্ন তুলবেনই যে সরকারি পদে প্রার্থী নির্বাচনের যোগ্যতা কী শুধুই দলীয় আনুগত্য নাকি গুণগত আনুগত্য?

রাজ্যের আমজনতা প্রশ্ন তুলবেনই একদিন। সেদিনও কেউ কী বলবেন 'জনগণ দেশদ্রোহী'!

তড়িৎ চৌধুরি

প্রয়াত সুকুমারী ভট্টাচার্য

প্রয়াত হলেন ভারতের পুরা-ইতিহাসবিদ সুকুমারী ভট্টাচার্য। পুরোনো ভারতের শ্রেণী-বর্ণ-লিঙ্গ ভিত্তিক অসাম্যের কথা পুরান মহাভারত থেকে উদ্ধার করে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এদেশকে বোঝার এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। *অনীক* তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

প্রবন্ধ

হিন্দমোটরে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক : দায়ী কে?

আভাষ মুন্সী

ডানলপ, জেশপের পরে এবার বন্ধ হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র অটোমোবাইল কারখানা হিন্দমোটরস লিমিটেড। হিন্দমোটর হিসাবেই যাকে মানুষ এক ডাকে চেনে। প্রায় ২৪০০ শ্রমিক ও তাদের পরিবার চরম দুর্দশায় পড়লেন। গত ২৩ মে ২০১৪ সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ভোর তিনটের সময় কর্তৃপক্ষ সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় কারখানার গেটগুলিতে।

প্রায় স্বাধীনতার সময়কাল থেকেই হিন্দমোটরের গাড়ি দেশের মানুষের কাছে আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে পরিচিতি লাভ করে এসেছে। দেশের তাবড় মান্যগণ্য জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে ভাড়ার ট্যাক্সি সবক্ষেত্রেই অ্যাম্বাসাডার ছিল গ্রহণযোগ্য। বিগত ৯০-এর দশকের শেষের দিক থেকেই এই যাত্রীবাহী গাড়ি বাজারে সংকটের মুখে পড়ে। এর আগের পর্যায় অবধি হিন্দমোটরের অ্যাম্বাসাডার গাড়িরই ছিল দেশের বাজারের একচ্ছত্র দখল।

হিন্দুস্থান মোটরস ১৯৪২ সালে বরোদার ওখাতে স্থাপিত হয়। ১৯৪৪-৪৫ সালে ইউ-কে স্থিত কোম্পানি মরিস মোটরস লিমিটেডের সাথে কারিগরি, যন্ত্রাংশ সংযুক্তিকরণ সহ বিভিন্ন আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। উৎপাদন শুরু হয় মরিস-১০ গাড়ি। ১৯৪৬ সালে তৎকালীন উত্তরপাড়ায় কারখানা তৈরির কাজ শুরু হয়। প্রথম অংশের কারখানার কাজ শেষ হয় ১৯৫০ সালে। সাথে সাথে রেজিস্টার্ড অফিসও ওখা থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ওখা প্ল্যান্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালে কোম্পানি ল্যান্ড মাস্টার গাড়ী উৎপাদন করতে শুরু করে। তার পর পরই ১৯৫৭ সাল থেকে তারা অ্যাম্বাসাডার গাড়ী উৎপাদন শুরু করে। সেই বছরই জেনারেল মোটর্সের সাথে চুক্তি হয়। ১৯৫৮ সালে ভক্সহল মোটরস, ইংল্যান্ড-এর সাথে বেডফোর্ড ট্রাক উৎপাদনের চুক্তি হয়। ১৯৫৯ সালে ম্যারিয়ন পাওয়ার কোম্পানি, ওহিয়ো, ইউএসএ ও ১৯৬০ সালে পশ্চিম জার্মানির কোম্পানি ম্যান-এর সাথে দুটি চুক্তি সাক্ষর করে হিন্দমোটর কর্তৃপক্ষ। শুরু হয় ওভারহেড ক্রেন, ক্রেন সহ ভারী শিল্পের প্রয়োজনে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরি। এর সাথে বিভিন্ন দেশীয় ও বিদেশি প্রযুক্তির সংমিশ্রণে যাত্রীবাহী গাড়ীর ৯৫ শতাংশ ও ট্রাকের ৮০ শতাংশ যন্ত্রাংশের দেশীয় বাজার দখল করতে সক্ষম হয়। গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ হিসাবে ইঞ্জিন, গিয়ার বক্স, সামনের ও পিছনের এক্সেল, চেসিস ফ্রেম, রেডিয়েটার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৭৪০ একর জমিতে গড়ে ওঠে বিড়লাদের সাম্রাজ্য। যার জমি তৎকালীন সরকার প্রায় নামমাত্র মূল্যে ব্যবহারিক স্বত্বে তাদের দিয়েছিল। কোম্পানি অগুণতি উৎপাদন সম্ভারে এই কারখানা এলাকার সীমা ছাড়িয়ে দেশের প্রধান গাড়ী উৎপাদনকারী সংস্থা হিসাবে উঠে আসে। চার দরজার অ্যাম্বাসাডার, বেডফোর্ড ট্রাক, বেডফোর্ড বাস, ডিজেল ইঞ্জিন, স্টিলকাস্টিং, এক্সক্যাভেটর, বৈদ্যুতিক ওভারহেড ট্র্যাভেলিং ক্রেন, ব্রিজ ফ্যাব্রিকেশন, হেভি প্লেট গ্রিডার, ওয়েলডিং পাইপ, স্পিলওয়ে গেট, প্রেসার ভেসেলস্, চিমনি ইত্যাদি যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

হিন্দমোটরে ১৯৬৩-৬৬ সালে
গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদিত পণ্যের বার্ষিক হিসাব

	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬
গাড়ি (অ্যাম্বাসাডার)	১০,৬৯৯	১৬০০০	১৬৫০০
ট্রাক (বেডফোর্ড)	৫৪১৭	৫৭১৭	৪০০০
ক্রেন	১৬	৩৫	৫০
স্ট্রাকচার (টনে)	২৯৭৪	৩২৫৩	১৮৩০

এর পরবর্তীতে কোম্পানি ১৯৬৬ সালের থেকে কারখানা সম্প্রসারণ করে, ও সেই বছর থেকেই ২০০০০-২৪০০০ যাত্রীবাহী গাড়ি (অ্যাম্বাসাডার) উৎপাদন করতে থাকে ধারাবাহিকভাবে। নভেম্বর ১৯৬৮ ইঞ্জিন বানানোর (গাড়ি ও ট্রাক) নতুন প্ল্যান্ট বসায়, যেখানে ৩৮ হাজার গাড়ীর ও ১৫ হাজার ট্রাকের ইঞ্জিন বানানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালে শ্রমিক ও কর্মচারী মিলিয়ে ছিলেন সর্বমোট ১১,১৮২ জন। যার মধ্যে সুপারভাইজার ১৯৬ জন ও ক্লারিক্যাল পারসোনেল ৯৫৮ জন। শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ছিল ৮৭৩৫ জন। যার মধ্যে ছিলে স্কিল্ড ২৩৬৯, সেমি-স্কিল্ড ৫৫৫৭ ও আন-স্কিল্ড ৮০৯ জন। এছাড়াও প্রায় ৩০০০ শ্রমিক, সুপারভাইজার ও অন্যান্য স্টাফ ও তাদের পরিবার সহ ৭ হাজার মানুষ কারখানা সংলগ্ন কোয়ার্টারে থাকতেন। বর্তমানে যা অনেক কমে মাত্র ৮০০ জনে এসে ঠেকেছে। এর সাথে ছিল একটি হাসপাতাল, যেখানে এখনও এলাকার বহু মানুষের চিকিৎসা হয় পয়সার বিনিময়ে। পূর্বে যা শুধুমাত্র শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্যই ব্যবহার হতো। রয়েছে একটি হিন্দি ও ইংরাজী মাধ্যম স্কুল, দ্বাদশশ্রেণী অবধি। রয়েছে ২টি খেলার মাঠ। পূর্বে যাতে বিভিন্ন রকম খেলাধূলার ব্যবস্থা ছিল।

১৯৯৪-৯৫ সালে কোম্পানিতে রেকর্ড উৎপাদন হয়। প্রায় ১৪০০০ শ্রমিক কর্মচারী শুধুমাত্র অ্যাম্বাসাডার গাড়িই দৈনিক

১০০টি করে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। তার সাথে ট্রাক, ট্রেকার, নতুন সংযোজিত কনটেসা সব বিভিন্ন ইঞ্জিন, যন্ত্রাংশ ধরলে ১৯৬৬-র হিসাব থেকে প্রায় সব ক্ষেত্রেই উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।

১৯৮০ সালের পরবর্তীতে মারুতি ৮০০ সহ অন্যান্য গাড়ি বাজারে এলেও হিন্দুস্থান মোটরস-এর উৎপাদন ও বাজার ১৯৯৭ সালের আগে খুব বেশি ধাক্কা খায়নি। কিন্তু ১৯৯৭-৯৮ থেকেই কোম্পানির ব্যবসায়িক নীতি ও কারখানা আধুনিকীকরণের অনীহার কারণে বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। একদিকে গাড়ির বাজারে মারুতি সহ লাগাতার অন্যান্য দেশিবিদেশি গাড়ির আগমন ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের কাছে হিন্দুস্থান মোটরস প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। উল্টোদিকে, গাড়ির বাজার অস্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যে কোম্পানি ১৯৬৬ থেকে ১৯৮৫ অবধি ভারতীয় গাড়ির বাজারের সিংহভাগ দখল করে রেখেছিল, গড়ে তুলেছিল একচেটিয়া কারবার, সেই কোম্পানি ১৯৯০ সালের পরবর্তীতে ক্রমবর্ধমান উন্নত গাড়ি-বাজারের হালে পানি পাচ্ছিল না। যদিও তার পুরোনো উৎপাদন পদ্ধতি দিয়ে ১৯৯৭-২০০০ সাল অবধি গাড়ি-বাজারের ৪-৫ শতাংশ তার দখলে ছিল। যা ক্রমহ্রাসমানভাবে বর্তমানে তলানিতে এসে ঠেকেছে। তথ্য অনুযায়ী ৯৯-২০০০ সালে ২১০০০, ২০০০-০১ এ ২০০০০ গাড়ি উৎপাদন হয়েছিল। তৎকালীন শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা ৮৭০০-তে নেমে আসে। বর্তমানে কর্তৃপক্ষের সাসপেনশন অফ ওযার্কের নোটিশে দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে সেই সংখ্যা আরও কমে হয়েছে ২০০৮-০৯ সালে ৫৫৭৪, ২০০৯-১০ সালে ৮৫১৯, ২০১১-১১ সালে ৬৮০১, ২০১১-১২ সালে ২৬৬৮, ২০১২-১৩ সালে ৩৬০২, ২০১৩-১৪ সালে ২৪৩৯।

একদিকে ভারতবর্ষে যখন বর্তমানে গাড়িশিল্পে মন্দা চলছে সেইরকম সময়েও বছরে প্রায় ১২-১৪ লাখ গাড়ী বিক্রি হচ্ছে। সেখানে এক সময়ের পাইওনিয়ার সংস্থা হিসাবে হিন্দুস্থান মোটরস ১ শতাংশ বাজারও বর্তমানে ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। বর্তমান বাজারের ২ শতাংশেরও কম বাজার দখল করতে পারলেও তার কারখানা লাভজনক ভাবে চলতে পারে। ১৯৯৭-৯৮ সাল নাগাদও বছরে ২০০০০ গাড়ি বানিয়ে তারা প্রায় ৯ হাজার শ্রমিক সহ মুনাফা করেছে। বর্তমানে শ্রমিক সংখ্যা তার থেকে অনেক কমে প্রায় ২৪০০।

বামফ্রন্ট সরকার ১৯৯১ সালের শিল্পনীতির স্বার্থে আমেরিকার ম্যাকিনসেকে রাজ্যের বিলগ্নিকরণ প্রক্রিয়া সহ উদারীকরণ নীতির পথ দেখানোর জন্য ডাকে। যার মধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকারি অধিগৃহীত সংস্থার (বেঙ্গল ল্যাম্প, গ্রেট ইস্টার্ন সহ ৮০টি সংস্থা) কর্মীদের ভিআরএস-এর নামে ছাঁটাই-এর পরিকল্পনা করে। সংস্থাগুলিকে বেসরকারি মালিকের কাছে জলের দরে বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো ডিএফআইডি-র টাকায় (পরিকাঠামো উন্নয়নের নামে)। ঠিক সেই সময়েই হিন্দুস্থান মোটর্স কর্তৃপক্ষ ম্যাকিনসেকে ডেকে এনে সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজতে লাগল। পথ একটাই— শ্রমিক সংকোচন, শ্রমিকদের বেতন হ্রাস (২০০১ থেকে ডিএ ফ্রিজ) ইত্যাদি। অর্থাৎ স্থায়ী কর্মী কমানো। পাশাপাশি কারখানা আধুনিকীকরণের কোন পরিকল্পনা না করা। লাগাতার ভাবে কারখানাকে সংকুচিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কখনও হিন্দমোটরের এক অংশ যা হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং হিসাবে পরিচিত ছিল তাকে বিক্রি করা হয় টিটাগড় ওয়াগন কোম্পানির কাছে, কখনও কাটার পুলার কোম্পানি বিক্রি করে দেওয়া ইত্যাদি। কর্তৃপক্ষ ২০০৫-২০০৬ সালে তৎকালীন সরকারের কাছে কারখানার সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্বৃত্ত জমি (৩১৪ একর) যা আসলে শুধু ব্যবহার করার স্বত্ব ছিল, তা বিক্রি করে টাকা জোগাড়ের অনুমতি চেয়ে প্রস্তাব দেয়। ২০০৬ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর সরকার বিধানসভায় ১৪ জেড ধারার ১ নং উপধারা বলে ১০.৫০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে অনুমতি দেয়। রাজ্যপালের গেজেট এর ৮ নং পয়েন্টে বলা হলো : "হিন্দুস্থান মোটরস কর্তৃপক্ষকে এই ৩১৪ একর জমির উন্নয়ন তথা উপরোক্ত নির্মাণ ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটানোর পূর্ণ অধিকার দেওয়া হলো। প্রয়োজনে ঐ ৩১৪ একর জমি বিক্রয় ও লিজও দিতে পারে। সমগ্র প্রক্রিয়ার সর্বনিম্ন ৮৫ কোটি টাকার তহবিল গড়ার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যে টাকা উত্তরপাড়া অটোমোটিভ ইন্ডাসট্রিয়াল কমপ্লেক্সের পুনরুজ্জীবনের জন্য ব্যয় করতে এইচএম কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে। এই ৮৫ কোটি টাকার মধ্যে ৭০ কোটি টাকা উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন তথা যন্ত্রের আধুনিকীকরণের কাজে ব্যয় করতে হবে। বাকী ১৫ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া মেটানোর জন্য এবং শ্রমিক কর্মচারীদের বেনিফিট ফান্ডের ঘাটতি মেটাবার জন্য তথা শুধু এই ধরনের এই ধরনের কাজের জন্য।" ১৩ নং পয়েন্টে বলা হলো : "যদি এই প্রকল্পের কাজ ৭ (সাত) বছরের মধ্যে শেষ না হয় বা নির্ধারিত ৮৫ কোটি টাকা উন্নয়নের খাতে ব্যবহার না করা হয় তবে এইচএম-এর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কথা মাথায় রেখে এইচএম কর্তৃপক্ষের বক্তব্য শুনে এই আদেশ পরিবর্তন অথবা বাতিল করা হবে।" ১৪ নং পয়েন্ট অনুযায়ী এইচএম কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে শিল্প পুনর্গঠন দপ্তর এবং ভূমি ও ভূমি-সংস্কার দপ্তরকে পর্যায়ক্রমে অবহিত করতে বাধ্য থাকবে।"

রাজ্যপালের আদেশানুযায়ী তৎকালীন জয়েন্ট সেক্রেটারি দ্বারা এই নোটিফিকেশন জারি হলো। কর্তৃপক্ষ ৮৫ কোটি নয়,

এর পর ১৪ পৃষ্ঠায়

নির্বাচন : ২০১৪

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন— বিশ্লেষণের প্রয়াস

অরিজিৎ

বিজেপির জয় কংগ্রেসের পরাজয়

আরো একটা লোকসভা ভোট হয়ে গেল। স্বাধীনতার পর থেকে সেই হিসেবে ষোড়শ লোকসভা। এই গোটা সময় পর্বে ভারতের রাজনীতি যে পথে এগিয়েছে, চলার পথে নিত্যনৈমিত্তিক যেসব নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে সেই বিচারে এই ভোটটি আলাদা করে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ এমনটা মোটেও নয় কিন্তু বেশ কিছু স্থায়ী সমীকরণ ওলটপালট হয়ে গেছে, কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রাধান্যকারী হয়ে উঠেছে— এক কথায় বলা যায় হাজারো বিষয় নতুন করে ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে ভোটের পরে। একটা পুরোদস্তুর নির্বাচনী বিশ্লেষণের বদলে আমরা সেই দিকগুলো নিয়েই আলোচনা করব।

ভোটের আগেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল এবার মোদির নেতৃত্বে এনডিএ জোট ক্ষমতায় আসতে চলেছে। ফলাফলও তাই দেখিয়েছে, শুধু তাই নয় প্রত্যাশারও অনেক ওপরে হিসেবের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৪ সালের পর যেখানে ভারতে কোনো রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি, জোরদার হয়ে উঠেছিল জোট-রাজনীতি, জাতীয় রাজনীতিতে প্রাদেশিক দলগুলোর ভূমিকা যখন ক্রমবর্ধমান, তখন ত্রিশ বছর পর একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজেপি-র ক্ষমতাসীন হওয়া গুরুত্বপূর্ণ বৈকি। জাতীয় কংগ্রেস পুরো ধরাশায়ী, ১৯৮৯ সালে বিজেপি যে কটি আসনে জিতেছিল (৮৯) তারও অর্ধেক (৪৫)— বলা ভালো রেকর্ড সংখ্যক কম আসন পেয়ে পরাজয়। ইউপিএ জোটের মোট আসন দাঁড়িয়েছে সাকুল্যে ৫৮টি। অন্যদিকে বিজেপি একাই ২৮২, আর এনডিএ জোট ৩৩৪। তা সত্ত্বেও বিরোধী দলগুলোর অস্তিত্ব অব্যাহত, যা ভবিষ্যতে নতুন সমীকরণের জন্ম দিতে পারে।

বিজেপি-র ভোট শেয়ার ৩১ শতাংশ। আর এনডিএ জোটের ৪২ শতাংশ। অন্যদিকে কংগ্রেসের ভোট শেয়ার ১৯.৩ শতাংশ, আর ইউপিএ-র ভোট শেয়ার ২৩.২ শতাংশ।

জাতীয় দলগুলো প্রাপ্ত ভোট (শতাংশে)

দল	*শতাংশ*
বিজেপি	৩১%
কংগ্রেস	১৯.৩%
বিএসপি	৪.১%
তৃণমূল	৩.৮%
এসপি	৩.৪%
এডিএমকে	৩.৩%
সিপিএম	৩.২%
নির্দল	৩%
টিডিপি	২.৫%
ওয়াইএসআরসিপি	২.৫%
আপ	২%
এসএইচএস	১.৯%
ডিএমকে	১.৭%
বিজেডি	১.৭%
এনসিপি	১.৬%
আরজেডি	১.৩%
টিআরএস	১.২%
জেডি(ইউ)	১.১%
সিপিআই	০.৪%
জেডি(এস)	০.৭%
ডিএমডিকে	০.৪%
আরএসপি	০.৩%
ফরোয়ার্ড ব্লক	০.২%
সিপিআই(এমএল)	০.২%
নোটা	১.১%

ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে একসাথে অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে। বিভিন্ন সংসদীয় দল বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। স্বাধীনতার পরের কুড়ি বছর কংগ্রেস দলেই সবরকম স্বার্থের প্রতিনিধিরাই উপস্থিত ছিল। রাষ্ট্রশক্তির বকলমে কংগ্রেস দলটিই শাসক গোষ্ঠীর এই স্বার্থগুলোর ভারসাম্য একভাবে রক্ষা করে চলত। এরকম একটা মধ্যপন্থী দল যে মানুষের কোনো স্বার্থকেই একটা পর্যায়ের পর চরিতার্থ করতে পারে না তা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে থাকে এবং নানান আঞ্চলিক দল গড়ে উঠতে থাকে নানান স্বার্থকে আঁকড়ে ধরে। কখনো সেটা দলিত, কখনো মুসলিম, কখনো ধনী চাষি, কখনো পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে জাতিসত্তার আন্দোলন। গো-বলয়ের রাজনীতি একরকম তো দক্ষিণ ভারতের রাজনীতির চরিত্র অন্যরকম। কাশ্মীর বা উত্তর-পূর্ব ভারতের চরিত্র একদম অন্য। কখনো শিল্পায়ন আর শ্রমিক বিক্ষোভের ভারসাম্য, আবার কখনো কৃষি অর্থনীতিকে সামনে রেখে জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকে নিশ্চিত করার কার্যক্রম। এবারের ভোটে এহেন হাজারো প্রশ্নকে মোকাবিলা করেই মোদিকে ভোট পেতে হয়েছে। ব্যাপারটা সহজ ছিল না।

নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান

দেশের বেশিরভাগ মানুষই শ্রমদানের সঙ্গে জড়িত থাকলেও তাঁর কাছে নিজের শ্রেণীগত পরিচিতির তুলনায় জাতিগত, জাতপাতগত, ধর্মগত, প্রদেশগত এমনকি লিঙ্গগত পরিচিতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। বিভিন্ন সংসদীয় দল মানুষের যে পরিচিতিটা নিয়ে রাজনীতি করছে সে ব্যাপারে একটা দূর পর্যন্ত তারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কাজ করছে এবং সেই অনুযায়ী মানুষের সেই পরিচিতির বোধ মানুষের মধ্যে বাড়িয়ে তুলে চলেছে তাদের প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে। একথা

সত্যি, সমাধানের পথে না হেঁটে এগুলোকে তুরুপের তাস হিসেবেই ব্যবহার করছে তারা। কিন্তু লাগাতার শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে মানুষের শ্রেণী-পরিচিতিকে বাড়িয়ে তোলার যে কাজ বামপন্থীদের করার ছিল সংসদীয় বামরা বহুদিন আগেই সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। শ্রেণীসংগ্রামে সংগ্রামী বামেদের উপস্থিতি থাকলেও তা দুর্বল। ফলত শ্রেণীসত্তার তুলনায় অন্য সত্তাগুলো মানুষের বেশি জাগরিত হয়েছে। এরকমই পরিস্থিতিতে যখন একটা মধ্যপন্থী (বাম ডান উভয়ই) দলের কাছে মানুষের প্রত্যাশা ক্রমশ কমতে থাকে তখনই ফ্যাসিস্ট শক্তির জন্ম হয়। নির্বাচনী বিশ্লেষণও সেকথাই বলছে।

আর্থিক কেলেঙ্কারি, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্বলতা

জাতীয় স্তরে মোদির সাফল্য আর কংগ্রেসের ব্যর্থতার ব্যাপারে অনেকগুলো কারণ একসাথে কাজ করছে। আলোচনায় যেগুলো উঠে আসছে তার মধ্যে প্রথমটাই হলো দুর্নীতি এবং আর্থিক কেলেঙ্কারি। ২জি স্পেকট্রাম, কোল-গেট কিংবা কমনওয়েলথ গেম্‌স নিয়ে দুর্নীতির প্রসঙ্গ ইউপিএ-২ সরকারকে জেরবার করে দিয়েছে। দেশ জোড়া আন্দোলনও চলেছে বিগত বছরগুলোতে এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে, আন্না হাজারে বা রামদেবের নেতৃত্বে। যার ফলশ্রুতিতে আম আদমি পার্টির জন্ম জাতীয় রাজনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দুর্নীতির প্রসঙ্গ কংগ্রেসকে অস্বস্তিতে ফেলেছে বা মানুষ কংগ্রেসের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছে একথা যেমন সত্যি, তেমনই এও সত্যি যে দুর্নীতিই যদি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হত তাহলে আম আদমি পার্টির ফলাফল অনেক ভালো হত।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগটা অর্থনীতি সংক্রান্ত। ইউপিএ-২-এর আমলে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি কম হয়েছে। এটিও একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর বটে কিন্তু মূল বিষয় নয়। গত কয়েক দশকের মধ্যে সবথেকে ভালো অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হয়েছিল ২০০৯-এ, কিন্তু সেই নির্বাচনেও আগের নির্বাচনের তুলনায় কংগ্রেসের প্রার্থী বেড়েছিল মাত্র ৫৪টি। সে হিসেবে ২০১৪ সালের নির্বাচনে ২০০টি আসন কমে যাওয়াটা সমীচীন নয়। অর্থনৈতিক অবস্থা বা বৃদ্ধির হারও এমন ধ্বসে পড়েনি যে সর্বকালের খারাপ ফলাফল হলো কংগ্রেসের।

তৃতীয় বিষয়টি হলো মনমোহন সিং-এর দুর্বল প্রশাসক ও গান্ধী পরিবারের ক্রীড়নক হিসেবে প্রচার, এবং সংগঠক হিসেবে রাহুল গান্ধীর দুর্বলতা। দুটি ক্ষেত্রেই তুলনায় মোদির দক্ষতা নিয়ে প্রচার চলেছে। নেহরু আর ইন্দিরা গান্ধীর পর টানা দশ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এই প্রথম মনমোহন সিং, অতীতের নরসীমা রাও-এর মন্ত্রীসভায় তিনিই ছিলেন অর্থমন্ত্রী। ভারতে নয়া উদারীকরণের ব্লু-প্রিন্ট তাঁর আমলেই তৈরি। তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলেই তা সর্বাত্মক রূপায়িতও হয়েছে এবং তার জন্য দেশব্যাপী বড়ো-সড়ো কোনো ভারসাম্যের সমস্যার মুখেও পড়তে হয়নি। খুব সুচারুভাবে কর্পোরেটে পুঁজির পক্ষে দাঁড়িয়ে এ কাজটি তিনি সম্পন্ন করেছেন। বিগত এক দশকে নয়া উদারীকরণের কোনোরকম বিরোধিতা বিজেপিও করেনি। প্রশাসক হিসেবে ব্যর্থতার বিষয়টি (পুঁজিপতিদের দিক থেকে দেখলে) ভোট প্রচারের ব্যাপারে ফলপ্রসূ হলেও বাস্তবত ঘটনাটা সেরকম নয়।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসছে কংগ্রেসের পরাজয়ের ব্যাপারে সেটা স্বাদ বদলের তত্ত্ব, পুরানো মুখের বদলে নতুন মুখের। বারবার বদল গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো ইত্যাদি।

মোদি হাওয়া: কর্পোরেটের সমর্থন, আরএসএস-এর সংগঠন

এবারের ভোটে কংগ্রেসের পতনের থেকেও মোদির উত্থানই গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলা যায় মোদির এহেন উত্থানই কংগ্রেসের বিপুল ধ্বসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রচারের তীব্রতা আর বুথ স্তর অবধি শক্তপোক্ত সংগঠনই বিজেপিকে এই জায়গায় এনে দিয়েছে। দলের অভ্যন্তরের একাধিক ক্ষোভ আর বিরোধকে আপাতভাবে মিটিয়ে ফেলে মোদিকে সামনে রেখে প্রচারের কাজ শুরু হয় গত বছর থেকেই। প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম আগাম ঘোষণা করে কার্যত নির্বাচনী রেসে বিজেপি প্রথমেই খানিক এগিয়ে যায়। দক্ষ প্রশাসক এবং সংগঠক হিসেবে মোদি কর্পোরেট দুনিয়ার কাছে বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন চারবারের মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়পর্বে। গোধরা দাঙ্গার রক্ত হাতে লেগে থাকলেও উন্নয়নের মোহজালে গুজরাটকে বানিয়েছেন পুঁজিপতিদের স্বর্গরাজ্যে। হিন্দুত্ব আর নয়া উদারনীতির সুন্দর ককটেল বানিয়েছেন গুজরাটে। মানব-উন্নয়নের সূচকে গুজরাটের মান যতই খারাপ হোক না কেন কর্পোরেটরাও চেয়েছে গুজরাটের উদাহরণ সামনে রেখে ভারত জুড়ে নয়া উদারনীতির দ্বার আরো মুক্ত করতে। এক্ষেত্রে কংগ্রেস দলটি তাদের চরম বশংবদ ও একান্ত অনুগত হলেও তারা নিঃশব্দে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পিছপা হয়নি, কারণ দীর্ঘদিন একই শাসক থাকলে এ ব্যবস্থার সঙ্কটজনিত কারণেই মানুষের প্রত্যাশা পূরণে তার অসমর্থতা প্রকট হয়। মানুষের আস্থা কমে, নতুন প্রকল্প করতে বাধা আসে, পুঁজির চলনে বন্ধ্যাত্ব আসে, অবস্থা স্থিতিশীল হয়ে আসে, বিদ্রোহের সম্ভাবনা বাড়ে। দুর্নীতি ও নানা কেলেংকারির ফলে ভাবমূর্তি কলুষিত হয়। কর্পোরেট দুনিয়ার দিক থেকে মোদিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার পিছনে একাধিক কারণ কাজ করেছে। যে দলটা কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্রের বিরোধিতা করে, মজবুত অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের ওপর চলে, সে দলেও আজ কার্যত মোদির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেটা কর্পোরেট দুনিয়ার চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই। কর্পোরেট প্রচারমাধ্যমগুলি প্রভূত বিজ্ঞাপন আর মোদীময় সংবাদ প্রচার, নির্বাচন-কেন্দ্রিক নানান টক শো,

বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যত কর্পোরেট স্বার্থকে সাধারণ মানুষের স্বার্থ হিসেবেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। গোটা ভারত জুড়ে সমস্ত বড়ো কাগজ, এমনকি ছোটখাটো আঞ্চলিক কাগজে রোজ বিজেপি-র বড় বড় বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে ভোটের পর্যায়ে, টিভি-র চ্যানেলে চ্যানেলে প্রচুর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, রাস্তা হোর্ডিংয়ে ছেয়ে গেছে। কংগ্রেস কিন্তু প্রচারে এর ধারে কাছে যেতে পারেনি। কর্পোরেটেরা বিজ্ঞাপনের জন্য কাকে বেশি টাকা দিয়েছে আর কাকে কম, সেটা পরিষ্কার। পাশাপাশি হিন্দুত্বের জিগির তুলে হিন্দু ভোটের গরিষ্ঠ অংশকে হাসিল করতে সমর্থ হয়েছে বিজেপি। আরএসএস-এর সংগঠন বরাবরই কংগ্রেসের মত শিথিল নয়, অনেক শক্তপোক্ত। ফলে এরকম একটা বাতাবরণকে কাজে লাগিয়ে ভোট বাক্সকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে বেশি বেগ পেতে হয়নি।

দলিত ভোট মুসলিম ভোট

দলিত স্বার্থ নিয়ে রাজনীতি গো-বলয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি/মায়াবতী) আর সমাজবাদী পার্টি (এসপি/মুলায়ম) জাতীয় রাজনীতিতে দলিত ভোটের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত। মূলত বিহার, উত্তরপ্রদেশে শক্তিশালী হলেও গোটা দেশেই অল্পবিস্তর সংগঠন আছে। শতকরা হিসেবে দলিত জনসংখ্যা পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গে, মুসলিম জনসংখ্যা জম্মু-কাশ্মীর এবং পশ্চিমবঙ্গে অনেক বেশি— বিহার আর উত্তরপ্রদেশের তুলনায়। কিন্তু যেহেতু উত্তরপ্রদেশ আর বিহারে দলিত ইস্যুতে রাজনীতি প্রকট তাই এ রাজ্য দুটিতে বিজেপি-র ভালো ফল কঠিন ছিল। অথচ উত্তরপ্রদেশে ৮০-র মধ্যে ৭১টি আর বিহারে ৪২টির মধ্যে ২২টা পেয়েছে বিজেপি। এসপি পেয়েছে ৫টা আর বিএসপি একটিও নয়। বিহারে প্রায় ধরাশায়ী লালু (আরজেডি) আর নীতিশ (জেডিইউ)। প্রশাসনকে, বলা ভালো, আমলাতন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে ওপর থেকে রাজনীতি করার মায়াবতীর কৌশল কিংবা মুলায়মের দলীয় সন্ত্রাস তৈরির কৌশলও ধোপে টেকেনি। বিহারে নীতিশকুমারের বিজেপি-ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিতির দরুণ সংখ্যালঘু ভোটের বড় অংশকে লালুপ্রসাদের আরজেডি নিজের দিকে রাখতে সক্ষম হয়েছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম উত্তরপ্রদেশ থেকে একজনও মুসলিম সাংসদ নেই। এক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ভোট এই আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেছে আর তারই মধ্যে এবারের মোদিময় বাতাবরণে প্রতিটি কেন্দ্রে বিজেপি তার ভোট বৃদ্ধি করাতে সক্ষম হয়েছে। ফলাফল অন্তত সেদিকেই ইঙ্গিত করে। উত্তরপ্রদেশে বেশিরভাগ কেন্দ্রে দেখা গিয়েছে বিএসপি দ্বিতীয় স্থানে আছে।

জনসংখ্যার নিরিখে কোন রাজ্যে কত (শতাংশ)

তপসিলি জাতি		*মুসলিম*	
পাঞ্জাব	৩২	জম্মু কাশ্মীর	৬৭
পশ্চিমবঙ্গ	২৪	আসাম	৩১
উত্তরপ্রদেশ	২১	পশ্চিমবঙ্গ	২৫
তামিলনাড়ু	২০	কেরালা	২৫
হরিয়ানা	২০	উত্তরপ্রদেশ	১৮
রাজস্থান	১৮	বিহার	১৬
উড়িষ্যা	১৭	কর্নাটক	১২
কর্নাটক	১৭	দিল্লী	১২
বিহার	১৬	মহারাষ্ট্র	১১
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৬	অন্ধ্রপ্রদেশ	৯
		গুজরাট	৯
ভারত	**১৭**	**ভারত**	**১৩.৪**

গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে উত্তরপ্রদেশের ৮টি কেন্দ্র, যেখানে মুসলিম ভোট প্রায় ৪০ শতাংশ, সেখানে সবকটিতে বিজেপি জিতেছে। বিহারে ১৭টা কেন্দ্র যেখানে ১৫ শতাংশের ওপর মুসলিম, তার ১২টায় জিতেছে বিজেপি। গুজরাটের আমেদাবাদ, যেখানে মুসলিম ভোট নির্ধারক সেখানেও বিজেপি জিতেছে। দিল্লী উত্তর-পূর্ব কেন্দ্রের মুসলিম ভোট পরিষ্কারভাবে আপ আর এনসিপি-র মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেছে; তেলেঙ্গানার ১২ শতাংশ মুসলিম— সাধারণভাবে তারা টিআরএস-কে সমর্থন দিয়েছে। গুরগাঁও, যেখানে ৩৭ শতাংশ মুসলিম ভোট, লাদাখ, যেখানে মুসলিম ভোট ৪৭ শতাংশ, আসামের নওগাঁ, যেখানে মুসলিম ভোট ৫০ শতাংশ— এগুলিতেও বিজেপি জিতেছে।

গত ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল দেখাচ্ছে যে, বিএসপি-র দলিত প্রতিনিধি সবচেয়ে কম। দলিত ইস্যু তার রাজনীতির প্রধান হাতিয়ার হলেও অন্যান্য অংশের স্বার্থকে সুরক্ষিত করে এমনকি উত্তরপ্রদেশে ব্রাহ্মণ বর্গের সাথে হাত মিলিয়ে তাকে সংসদীয় রাজনীতিতে টিকে থাকতে হয়েছিল। খুব পরিষ্কারভাবেই অসংরক্ষিত আসনগুলিতে অ-দলিত ভোটও তারা নিজের ঝুলিতে পুরতে সক্ষম ছিল। আর উল্টোদিকে অ-দলিত পার্টিগুলোও দলিত ইস্যু কিছু পরিমাণে আত্মস্থ করে নেওয়ায় বিগত কয়েক বছরে দলিত রাজনীতির চরিত্র বদল হয়ে গেছে অনেকটা। তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে বিজেপি।

জাতপাতের রাজনীতি : বিহার উত্তরপ্রদেশ

এবারের নির্বাচনের ফলাফল দেখে অনেকেই মনে করছেন গো-বলয়ের জাতপাত নিয়ে রাজনীতি শেষ হয়ে গেল বা তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে গেল কিংবা কেউ কেউ মনে করছেন 'সকলের বিকাশ' নীতির প্রচারের মাধ্যমে বিজেপি জাতপাতের বিভাজনকে প্রায় মুছে দিলেন। পরিসংখ্যান কিন্তু অন্য কথা বলছে— উত্তরপ্রদেশ বা বিহার, যেখানে জাতপাত রাজনীতির

উত্তরপ্রদেশ : জাতপাতগত ভোটের নিরিখে দলগুলোর ভোট (শতাংশে)

জাত	*মোট জনসংখ্যায়*	*কংগ্রস +আরএলডি*	*বিজেপি +এডি*	*বিএসপি*	*এসপি*
ব্রাহ্মণ		১১	৭২	৫	৫
রাজপুত	১৯.২	৭	৭৭	৫	৮
অন্যান্য উচ্চবর্ণ		৯	৭৬	৩	৭
যাদব		৮	২৭	৩	৫৩
কুর্মী/করি	৪০	১৬	৫৩	৪	১৭
অন্যান্য ওবিসি		৮	৬০	১১	১৩
জাতব	২১.১	২	১৮	৬৮	৪
অন্যান্য দলিত		৪	৪৫	২৯	১০
মুসলিম	১৮	১১	১০	১৮	৫৮
অন্যান্য		১০	৫১	২০	১৭

সূত্র : *দ্য হিন্দু*, ২৩ মে, ২০১৪

অঙ্গ, সেখানে আঞ্চলিক দলগুলো মূলত যাদের প্রতিনিধিত্ব করে (এসপি বা আরজেডি মূলত যাদব আর মুসলিমদের, বিএসপি মূলত দলিত, জেডি মূলত কুর্মী, এলজেপি মূলত দলিত ইত্যাদি) তাদের ভোট কিন্তু তারা পেয়েছে। কিন্তু অন্যান্য নির্বাচনে যেমন এরা সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের ভোট পায় তাৎক্ষণিক দরকষাকষির ওপর, সেটা এ নির্বাচনে আদৌ হয়নি। বিজেপি-র দীর্ঘদিনের ভোটব্যাংক উচ্চবর্ণ (ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ভূমিহার) আর নিম্নবর্গ ওবিসি। কংগ্রেসেরও ভোটব্যাংক এটাই। এই ভোটটা বিজেপি এবারে বিভাজিত হতে দেয়নি। সিংহভাগটাই সে পেয়েছে। কুর্মী সম্প্রদায় কিংবা দলিতদের একাংশ, সাধারণভাবে যাদের শক্তিশালী প্রতিনিধি সংসদীয় রাজনীতি নেই, সাধারণভাবে যারা দোদুল্যমান, তাদের ভোটকেও এক জায়গায় করতে পেরেছে বিজেপি।

আগের নির্বাচনগুলিতে উচ্চবর্ণের ভোট নানান স্বার্থরক্ষার জন্য আঞ্চলিক দলগুলো পেত, এবারে অন্তত উচ্চবর্ণের ভোটের ভয়ানক মেরুকরণ হয়েছে। সমাজবাদী পার্টির যাদব আর মুসলিমদের সমর্থন অব্যাহত আছে, যদিও যাদব ভোট কমেছে এবং অন্যান্য অংশেরও ভোটও কমেছে। বহুজন সমাজ পার্টির জাতব ভোটও একই আছে কিন্তু অন্যান্য দলিত, নিম্নবর্ণের ওবিসি বা মুসলিমদের তারা ভোট পায়নি। সমর্থনের ক্ষেত্র এভাবে সঙ্কুচিত হওয়ার জন্যই এই দুটি দলের লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিজেপিও সমান গুরুত্ব দিয়ে সব মানুষকে সমান মনে করে কেবল উন্নয়নের প্রচার দিয়ে এখানে সাফল্য পায়নি, কোন অংশের ভোট সে পেতে চায়, কোন অংশের ভোট সে পাবে না, তার জন্যে কার কার সাথে প্রকাশ্য বা গোপন আঁতাত করতে হবে, কোথায়ই বা সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখতে হবে আর কোথায় হবে না সেটাই সুচারুভাবে করেছে। অর্থাৎ জাতপাত-ভিত্তিক রাজনীতি টিকিয়ে রাখা হলো, বিভাজন হয়তো তীব্রতর হলো, কিন্তু দর কষাকষির জন্য বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি থাকার রাস্তাটা মেরে দেওয়া হলো। বিজেপি-র কার্যসিদ্ধি হল— বেশিরভাগ আসনে তারা জিতলো। মোট প্রদত্ত ভোটের নিরিখে তৃতীয় বৃহত্তম (৪ শতাংশ) দল হয়েও বিএসপি-র ঝুলি শূন্য— এ এক ভয়ানক ব্যাপার।

বিহারের ক্ষেত্রেও এমন বিশ্লেষণ করা হচ্ছে যেন মানুষ জেডি(ইউ)র সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষায় বিজেপি-কে ভোট দিয়েছে নিজেদের জাতিগত, ধর্মগত পরিচিতিকে ভুলে গিয়ে। ঘটনা ঠিক উল্টোটাই। এখানে বিজেপি এমন একটা কার্যকর জোট তৈরি করেছে যা সমস্ত জাতের প্রতিনিধিদের মঞ্চ। জোটে সঙ্গী রামবিলাস পাসোয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)

বিহার : জাতপাতগত ভোটের নিরিখে দলগুলোর ভোট (%)

জাত	*মোট জনসংখ্যায়*	*বিজেপি*	*আরজেডি*	*জেডি(ইউ)*
উচ্চ বর্ণ	২৩	৭৮	৫	৮
যাদব		১৯	৬৪	১২
কুর্মী	২২.৫	২৬	১৫	৩০
নিম্নবর্ণ ওবিসি	২৭	৫৩	১০	৬
দুসাধ		৬৮	১০	৬
অন্যান্য দলিত	১৭	৩৩	১০	২৫
মুসলিম	১৬	২	৬৪	২১

সূত্র : *দ্য হিন্দু*, ২৩ মে, ২০১৪

দলিতদের প্রতিনিধিত্ব করে আর রাষ্ট্রীয় লোক সমতা পার্টি (আরএলএসপি) করি সহ ওবিসিদের একাংশের সমর্থিত। উল্টোদিকে আরজেডি-কংগ্রেস চেষ্টা চালিয়ে গেছে যাদব আর মুসলিম ভোটকে এককাট্টা করতে। ফলে বিহারে উচ্চবর্ণের আর দলিতদের এক অভূতপূর্ব মেরুকরণ ঘটল বিজেপি-এলজেপি জোটের দিকে। পাসোয়ানদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশের বেশিই বিজেপি-এলজেপি পেয়েছে কিন্তু অন্যান্য দলিত ভোট মোটেই তাদের পক্ষে যাইনি। জেডি(ইউ)-র ভোট মূলত কুর্মী সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশি, নীতিশ কুমার নিজেও এই সম্প্রদায়ের। আরএলএসপি-র সাথে বিজেপি-র জোট করি আর কুর্মী সম্প্রদায়ের ভোটকে নিজেদের পক্ষে খানিক রাখতে সক্ষম হয়েছে যেটা আসলে জেডি(ইউ)-র পরাজয়ের বড় কারণ।

কর্নাটক : কংগ্রেস পরাজিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত নয়

কর্নাটকে কংগ্রেসের পরিস্থিতি গোটা দেশের মতো এত খারাপ নয়, রাজ্যে ক্ষমতায় থাকলেও লোকসভা নির্বাচনে তারা বিজেপি-র কাছে পরাজিত হয়েছে। ২ শতাংশ ভোটের পার্থক্য নিয়ে বিজেপি ১৭টা আসন আর কংগ্রেস ৯টি আসনে জিতেছে, জনতা দল (সেকুলার) পেয়েছে ২টি। কর্নাটকের উল্লেখ এখানে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে গত বছরই। হায়দ্রাবাদ বা মহারাষ্ট্র সংলগ্ন জায়গাগুলোতে কংগ্রেস জিতেছে এবং এ জায়গাগুলো বরাবরই কংগ্রেসের শক্তিশালী ঘাঁটি, দক্ষিণ কর্ণাটকের দুটি আসন জেডি(এস) পেয়েছে আর উপকূল সংলগ্ন কেন্দ্রগুলোয় বিজেপি। স্থান নির্বাচন আর জাতিগত আঁতাতই এখানে বিজেপি-র সহায়ক হয়েছে। উচ্চবর্ণের আর নিম্নবর্ণের লিঙ্গায়েতদের ভোট তাকে এগিয়ে দিয়েছে। ভোক্কালিঙ্গাদের ভোট প্রায় সমান তিনভাগে বিভাজিত হয়েছে। কংগ্রেস ওবিসি, দলিত, উপজাতি আর মুসলিমদের সিংহভাগ ভোট পেয়েছে। কিন্তু আসনের হিসেবে কংগ্রেস অনেক পিছিয়ে থেকেছে।

তামিলনাড়ু : মোদি নয়, জয়ললিতা

আঞ্চলিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এবারে ভোটে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রইল তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ। তামিলনাড়ুতে এবারে ভোটের লড়াই ছিল চতুর্মুখী। জয়ললিতার এডিএমকে, করুণানিধির ডিএমকে নেতৃত্বাধীন ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স, ৭ পার্টি জোটের এনডিএ, আর কংগ্রেস। ডিএমকে এর আগের নির্বাচনে ইউপিএ জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গত বছর মার্চ মাসে শ্রীলঙ্কা ইস্যুতে ইউপিএ থেকে তারা সমর্থন তুলে নেয়। বিগত পর্যায়ে ইউপিএ-র নানা দুর্নীতিতে ডিএমকে-র একাধিক নেতৃত্বের নাম জড়িয়ে পড়ে। ২জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারির অন্যতম এ রাজা ডিএমকে-র সাংসদ ছিল। জাতীয় স্তরে কংগ্রেসের আর রাজ্যে ডিএমকে-র জনপ্রিয়তা হ্রাস একই সুতোয় জড়িয়ে ছিল। আর উল্টো দিকে কাজ করেছে জয়ললিতার হাওয়া। মোদির প্রচারের মধ্যেও জয়ললিতার নেতৃত্বে আঞ্চলিক শক্তিগুলোর তৃতীয় একটা জোটের সম্ভাবনাও উঁকি মারছিল ভোটের তিন-চার মাস আগেও। সে সম্ভাবনা ফলপ্রসূ না হলেও রাজ্যের ফলাফলে ভীষণভাবে কাজ দিয়েছে। তামিলনাড়ুতে ৩৯টি আসনের মধ্যে ৩৪টাই এডিএমকে-র আর দুটো এনডিএ জোটের। কার্যত তামিলনাড়ুতে কংগ্রেস আর ডিএমকে-র ঝুলি পুরো ফাঁকা। বিজেপি-র অস্তিত্ব বরাবরই এরাজ্যে কম, কিন্তু ডিএমডিকে, পিএমকে আর জাতপাত-ভিত্তিক কিছু দলের সাথে জোট করে বিজেপি-র ভোট বেড়েছে।

উড়িষ্যা : বিজেপি নয়, বিজেডি

উড়িষ্যাতে আটকে গেছে বিজেপি-র বিজয় রথ, আর কংগ্রেসও ধরাশায়ী। নবীন পট্টনায়কের বিজেডি-র ভোট আগের তুলনায় বেড়েছে। রাজ্যে ২১টার মধ্যে ২০টাতেই জিতেছে তারা। আর বিজেপি ১টায়। এ রাজ্যে বিগত পর্যায়ে খনি, বন্দর ইত্যাদি নিয়ে পসকো, নিয়মগিরির মতো একাধিক আন্দোলন হলেও তার ছাপ সংসদীয় রাজনীতির নিরিখে চোখে পড়ার মতো নয়। আন্দোলনগুলোও এত ছড়ানো-ছিটানো আর ছোটখাটো গোষ্ঠীর আন্দোলন হিসেবে একটার থেকে আর একটা এত বিচ্ছিন্ন যে বৃহত্তর ক্ষেত্রে তার প্রভাব পরিমাপ করা সম্ভবও নয়। একটাই মন্তব্য করা যায়, এমনভাবে বিজেডি নানান স্বার্থের মধ্যে সমতা রক্ষা করে গেছে, ভোটের হিসেবে কোনো ক্ষতি হয়নি পট্টনায়কের। একই সাথে এরাজ্যে বিধানসভা ভোট হয়েছে। চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হলেন নবীন পট্টনায়ক। 'নতুন মুখের' তত্ত্ব এখানে খাটেনি। তবে দেশ জুড়ে এবারের ভোটে যেভাবে দুর্নীতির ইস্যু একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছিল তাতে নবীন পট্টনায়কের দীর্ঘদিনের স্বচ্ছ ইমেজ এই ফলাফলের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ : সীমান্ধ্র ও তেলেঙ্গানা

এবার অন্ধ্রপ্রদেশের কথা। অন্ধ্র বিভাজন এ নির্বাচনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। নানা টানবাহানার পর পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য হওয়ার পরেও তা থেকে কংগ্রেস লাভবান হয়নি, বরং তেলেঙ্গানায় পৃথক তেলেঙ্গানার দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলনরত চন্দ্রশেখর রাও নেতৃত্বাধীন টিআরএস ১৭টির মধ্যে ১১টি আসন দখল করেছে। কংগ্রেস ২টি আর বিজেপি-টিডিপি জোট দুটি। তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠন করলে টিআরএস কংগ্রেসের সাথে মিশে যাবে বলে যে আশ্বাস দিয়েছিল তা বাস্তবে কার্যকর হয়নি, বরং তারা এখন এনডিএ জোটের দিকে খানিক ঝুঁকছে।

আন্দোলনের মুখ হিসেবে টিআরএস-এর ওপর সাধারণ মানুষ আস্থা রাখলেও কেন্দ্রীয় বড় দলগুলোর সাথে চলার নীতি যে সাধারণ মেহনতি মানুষকে কিছুই দেবে না তা সংসদীয় রাজনীতির গণিত দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর বিভাজনের

কারণেই অবশিষ্ট অন্ধ্রপ্রদেশে (সীমান্ধ্রে) যে কংগ্রেস ভালো ফল করবে না তা স্পষ্ট ছিল। চন্দ্রবাবু নাইডু-র টিডিপি আর বিজেপি-র জোট ২৫টির মধ্যে ১৭টিতে জয়লাভ করেছে। আর কংগ্রেস একটাও আসন পায়নি। চন্দ্রবাবুর উন্নয়নের পুরানো মডেল আর মোদির উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রচার সীমান্ধ্রে এক আস্থাপূর্ণ জুটি হিসেবে কাজ করেছে সংসদীয় রাজনীতির নিরিখে। একই সাথে এ দুটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনও হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেক্ষেত্রেও এই সমীকরণের ব্যতিক্রম হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত লোকসভা নির্বাচনে অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশে ৪২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের ছিল ৩৩টি।

পশ্চিমবঙ্গ : তৃণমূলের জয়, বামফ্রন্টের হার, বিজেপি-র উত্থান

পশ্চিমবাংলায় ভোটদানের হার বরাবরই বেশি থাকে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গোটা দেশে সংখ্যাটা যখন ৬৬.৫ শতাংশ, বাংলায় তখন ৮২ শতাংশ। সাধারণভাবে বাংলায় লোকসভার ফলাফল কেন্দ্রীয় প্রবণতা অনুযায়ী হয় না, বরং রাজ্যের রাজনীতির নিরিখেই তা হয়ে আসছে গত কয়েক দশক ধরে। বিগত পর্যায়ে ঠিক যে কারণে বামফ্রন্ট বাংলা থেকে অনেক আসনে জিতে এসেছে, ঠিক সে কারণেই এবারে কিছু না পেতে পেতে শেষ অবধি কোনরকমে মুখ রক্ষা হয়েছে তাদের। এটাই বাংলায় স্বাভাবিক। বাংলার সংসদীয় রাজনীতিতে মেরুকরণ এতটাই তীব্র। তার ওপর সবেমাত্র রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে।

তবে এরাজ্যে বিজেপির উত্থান এর মধ্যে নতুন একটা ঘটনা। বিগত বিধানসভা, পঞ্চায়েতের তুলনায় তৃণমূলের ভোট খানিক বৃদ্ধি হলেও বিজেপির উত্থান একটা নতুন ঘটনা। মূলত বামফ্রন্টের ভোটব্যাঙ্কেই ধ্বস নেমেছে। একটা বড় অংশের মধ্যবিত্ত, বলা ভালো, নয়া উদারনৈতিক নীতির ক্ষীরটুকু যে অংশ ভোগ করে বা ভোগ করার স্বপ্ন দেখে তারা এতদিন স্রেফ সে কারণেই বামফ্রন্টকে ভোট দিত, সেই ভোটটা কোনোভাবেই বামফ্রন্ট ধরে রাখতে পারেনি। যে অংশটা ক্ষমতার সাথে চলতে চায়, সেই অংশের কিছু ভোট বামফ্রন্ট থেকে তৃণমূলের দিকে চলে গিয়েছে। ২০০৯ বা ১১-র ভোটে যারা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকারের কার্যকলাপে বিরক্ত এমন ক্ষুদ্র একটা অংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে, আর বেশ বড় একটা অংশ যারা ২০১১-র নির্বাচনেও সিপিএমকে ভোট দিয়েছিল তাদের ভোটে পুষ্ট হয়েছে বিজেপি— পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট। পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবির আন্দোলনের সমর্থন নিয়ে আগের বারের মতো এবারেও পাহাড়ের আসনটা বিজেপি-র দখলে আর তার সাথে নতুন সংযোজন আসানসোল। রাজ্যে অন্তত ২০টা বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে গেছে বিজেপি, তার মধ্যে খোদ কলকাতায় ভবানীপুর কেন্দ্রটি উল্লেখযোগ্য। কলকাতার দুটি কেন্দ্রেই বামফ্রন্টকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে বিজেপির উত্থান যথেষ্ট চিন্তার। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রধান বিরোধী শক্তি হয়ে উঠতে পারার আশঙ্কা করছেন বাংলার ওয়াকিবহাল মহল, সঙ্গে আতঙ্কিতও হচ্ছেন বটে।

২০১১-র নির্বাচনে মানুষ বামফ্রন্টকে আর ভোট দেবে না বলেই তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল তখন খুব একটা সংগঠিত দল ছিল না। ক্ষমতায় বসার পর থেকে দলটি রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হওয়ার কর্মসূচি নেয়। সে পন্থা নতুন কিছু নয়। সিপিএম-এর দেখানো পথই। বাম জমানা শেষ হয়েছিল যে অগণতান্ত্রিক, দলীয় সন্ত্রাসের বাতাবরণ দিয়ে, সেখান থেকেই শুরু হয়েছে তৃণমূলের যাত্রা। আর ইউনিয়ন, সংগঠন ইত্যাদির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা রেজিমেন্টেড পার্টি তাসের ঘরের মতো ধ্বসে পড়ছে। গোটা পৃথিবী জুড়েই এধরনের মধ্যপন্থী বামদের অস্তিত্ব সংকটে, এদের কাছে নতুন করে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা যে আর মানুষের নেই সেটা গোটা বিশ্ব জুড়েই সত্যি। বাংলায় এই নির্বাচনেও তারই প্রতিফলন ঘটল— আর তারই অনুপস্থিতি জনিত কারণে একটা হতাশাজনক পরিস্থিতিতে মোদি হাওয়া— ফ্যাসিস্ট শক্তির উদ্ভব। ১৯৩৩-এর জার্মানির ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয় তো? আবার এটাও ঠিক যে গোটা বিশ্ব জুড়ে বাম আন্দোলন নতুন করে দানা বাঁধছে, নতুন করে আশা যোগাচ্ছে। কিন্তু তা এই পুরোনো কায়দায় সংসদীয় রাজনীতি নয়। এ আলোচনা আমরা অন্য কোথাও করব।

এখানকার সিপিএম তথা বামফ্রন্ট নিয়ে দু-একটা কথা না বললেই নয়। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট সম্পূর্ণ দিকভ্রান্ত। কোন্ পথে চলতে হবে সে নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা বা কাজ করতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। নিজেদের জোরে নয়, কংগ্রেস-তৃণমূল ভোট-কাটাকাটিতে আর মোদি হাওয়ায় তৃণমূলের বদলে কিছু আসন তাদের হস্তগত হবে এমন একটা আশায় ছিলেন তারা। কী ভয়ানক ব্যাপার। বিজেপি-র উত্থানে কিছু আসন বাড়তে পারে— এই নাকি বামপন্থীদের আশা! তাঁদের সে আশা সফল হয়নি। কিন্তু নতুন করে পথ চলার কোনো চেষ্টা তাঁদের তরফ

পশ্চিমবঙ্গে বিগত তিনটি নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের নিরিখে দলগুলির প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ) তালিকা

দল	২০০৯	২০১১	২০১৪
তৃণমূল	৩১.১৯	৩৯.০৮	৩৯.০২
কংগ্রেস	১৩.৪৬	৪.৯১	৯.০২
বামফ্রন্ট	৪৩.২৮	৪১.০৫	২৯.৬
বিজেপি	৬.১৫	৪.০৬	১৭

সূত্র : নির্বাচন কমিশন

থেকে দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের আসনসংখ্যা ২-বিজেপির সমান। যদিও তাদের পাওয়া ভোট প্রদত্ত ভোটের ৩০ শতাংশ। বিজেপির ভোট ১৫ শতাংশ।

অন্যদিকে, সংসদীয় নির্বাচনে যেখানে কটা আসনে জিতেছে সেটাই বড় কথা সেখানে বিশেষ একটা লাভ হবে না জেনেও নরেন্দ্র মোদী বাংলায় একাধিক জনসভা করেছেন, এমনকি মমতাকেও নিজের দিকে টানতে চেষ্টা করেছেন। নির্বাচনী প্রচারের শুরুতেও তৃণমূলের অভিমুখ যতটা সিপিএম-এর প্রতি আক্রমণাত্মক ছিল, সময়ের সাথে সাথে সে অভিমুখ ঘুরে গিয়েছিল বিজেপি-র দিকে। প্রায় প্রতিটি জনসভায় মমতা নিজস্ব ভঙ্গিতে মোদিকে আক্রমণ করে গিয়েছেন। আর মোদী শান্ত গলায়, অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্তভাবে মিডিয়ার কাছে কিংবা জনসভায় তার উত্তর দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের ব্যাপক ভোটার, যারা মমতার ঐ নিজস্ব ভঙ্গিটি ভালোই বাসে তাদের ভোট নিয়ে অসুবিধে হয়নি, যারা ভালোবাসে না এবং বামফ্রন্টকে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে আলাদা কোনো মোহ নেই তারা সরাসরি বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। এককথায় মমতা বিজেপির সমালোচনা করে বিজেপির ভোট বাড়িয়ে দিয়েছে আর ভোট ভেঙেছে বামফ্রন্টের। একথা অনস্বীকার্য যে এ ব্যাপারে একনম্বর ফ্যাক্টরটা ছিল দেশব্যাপী যে বাতাবরণ কাজ করছে, কর্পোরেটদের সহায়তা, যুবসম্প্রদায়ের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা, অবাঙালী অংশের অভূতপূর্ব রকমের ভোটে অংশগ্রহণ ইত্যাদি। যে বাংলায় বড় অংশের মানুষ যে হেরে যাবে তাকে ভোট দেওয়াটা ভোট নষ্ট করা বলে বোঝে সেখানে বিজেপির এহেন ফলাফল অনেকগুলো কারণের সমাহার নিশ্চয়ই। বাংলার মুসলিম ভোট যে পাবে না সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিল মোদী। তাই এই রাজ্যের প্রচারে মুসলিম আর বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে আক্রমণাত্মক কথা বলেছে বিজেপি। এর ফলে অবশ্য মুসলিম ভোটও সংগঠিত হয়েছে এবং তা কাজ করেছে তৃণমূলের পক্ষে।

সংখ্যার নিরিখে জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূলের প্রাসঙ্গিকতা বাড়ল বটে কিন্তু এখনো মমতার সহজাত ভঙ্গির জন্য মমতাকে জাতীয় স্তরে প্রথম সারির মধ্যে ধরা হয় না। বিশ্বস্ত অনুচর হলেও এফডিআই বিরোধিতা ইত্যাদির মতো ঘটনায় কর্পোরেট জগতেরও একদম নিজের লোক নয় তৃণমূল। কিন্তু এতগুলো সাংসদ নিয়েও আদপে সংসদে কোনো কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে কিনা তৃণমূল সেটাই সন্দেহের। গোষ্ঠী কোন্দল ধামাচাপা দিতে যে ভাবে একাধিক সেলিব্রিটিকে (মূলত সিনেমা জগৎ থেকে) ভোটে দাঁড় করাতে হয়েছিল তৃণমূল নেতৃত্বকে— তারা আগামী পাঁচ বছরে কতবার নিজেদের এলাকায় যাবেন বা পার্লামেন্টে কেমন অংশগ্রহণ করবেন তা প্রশ্নসূচক। দীর্ঘদিনের গণআন্দোলনের পীঠস্থান, রাজনীতি সচেতন বাংলার এহেন ঝোঁক রাজনীতির পক্ষে নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিকর।

যুবসম্প্রদায়ের ভোট

এই নির্বাচনে বিজেপির জয়লাভের পেছনে আরো একটা ফ্যাক্টর হল গ্রামে শহরে সর্বত্র যুবসম্প্রদায়ের বিশেষত ১৮-২৩ বছর বয়সী ভোটারদের অংশগ্রহণ। প্রতি ভোটেই এই অংশের ভোটদানের হার বরাবর মোট প্রদত্ত ভোটদানের হারের থেকে কম থাকে, এবারে অল্প হলেও এই হার বেশি। গোটা দেশে সাধারণভাবে ভোটদানের হার যেখানে ৬৬.৫ শতাংশ-এর মতো সেখানে প্রথমবার ভোটদাতাদের অংশগ্রহণ ৬৮ শতাংশ। এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ মোদির উন্নয়নের প্রচার। উন্নয়নের প্রশ্নের সাথে কর্মসংস্থান যেভাবে জড়িয়ে থাকে তাতে যুবসম্প্রদায়েরই আশান্বিত হওয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। ছত্তিশগড়, দিল্লী, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট রাজ্যগুলিতে প্রথমবারের ভোটারদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি, এই অংশের ভোট বিজেপি-র ঝুলিকে শক্তিশালী করেছে মূলতঃ মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড আর রাজস্থানে। বিহার, হিমাচলপ্রদেশ, গুজরাট, হরিয়ানাতে বরং মধ্যবয়সীদের বেশি সমর্থন পেয়েছে বিজেপি। পরিসংখ্যান বলছে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়েদের অংশগ্রহণও বেড়েছে আগের তুলনায়।

'না' ভোট

কাউকেই ভোট না দেওয়ার অধিকার স্বীকৃতি পেল এবারের ভোটে। বিশ্বের ১৩তম দেশ হিসেবে ভারতে এই অধিকার স্বীকৃত হলো। বেশ কিছু মানবাধিকার সংগঠনের দীর্ঘ আইনি লড়াই-এর ফলশ্রুতিরূপে সুপ্রিম কোর্ট অবশেষে এই রায় দিয়েছে। যদিও এই নতুন বিষয়টি মানুষের গোচরে আনার জন্য ন্যূনতম প্রচার রাষ্ট্র বা নির্বাচন কমিশনের দিক থেকে চোখে পড়েনি। কিন্তু না ভোটে হ্যাঁ জানিয়েছে সারা দেশে ১.১ শতাংশ মানুষ, পশ্চিমবঙ্গেও হারটা একই— সংখ্যাটি অনেকগুলি জাতীয় দলের প্রদত্ত ভোটের তুলনায় বেশি। অসংসদীয় বাম, যারা নিষ্ক্রিয়ভাবে ভোটদানে বিরত থাকার তুলনায় নিজেদের রাজনৈতিক বক্তব্য আর দাবি নিয়ে ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের কথা বলে তাদের কিছু দলের দিক থেকেও *নোটা*-য় ভোটদানের আবেদন ছিল। পশ্চিমবঙ্গেই অন্তত দেখা গেছে ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়াতে *নোটা*-য় ভোট বেশি পড়েছে— জঙ্গলমহলের অতীত লড়াই মানুষের মধ্যে সংসদীয় রাজনীতির যেটুকু স্বরূপ উন্মোচন করেছে তারই সামান্য প্রতিফলন হয়ত দেখা গেছে ভোটের এই নতুন পছন্দের বিষয়টিতে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকাতেও *নোটা*-র প্রচার ছিল বামপন্থীদের একাংশের দিকে থেকে— ভোটবাক্সে না হলেও জনমানসে তার ক্ষীণ প্রভাব লক্ষণীয়। যারা ভোট দিতে যেতে

অনীহা প্রকাশ করে তারা সক্রিয়ভাবে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে নোটা-তে ভোট দিয়েছে এ ঘটনা অবশ্যই বিরল। দেশজুড়ে নানান কারণ রয়েছে নোটা-তে ভোটদানের পেছনে। বিশেষ করে সংরক্ষিত আসনে ব্রাহ্মণদের ভোটদানের ব্যাপারে এরকম ঝোঁক দেখা গেছে নানান জায়গায়।

আম আদমি পার্টি

এ নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্বের বিষয় আম আদমি পার্টি। বিগত দিনের দুর্নীতি নিয়ে আন্না হাজারের আন্দোলন থেকে উদ্ভব অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টির। দিল্লীর বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফল করে প্রচুর আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রী হলেও ৪৯ দিনের মাথায় তাঁর পদত্যাগ খুব ভালোভাবে নেয়নি কর্পোরেট জগৎ, মিডিয়া আর তাদের হাত ধরেই সাধারণ মানুষ। ফলে এবারে লোকসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল হয়নি তাদের। পাঞ্জাবে ৪টি ছাড়া আর আসন পায়নি কোথাও। সেখানেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল কংগ্রেস বা বিজেপির সাথে নয়, বরং শিরোমণি অকালি দলের সাথে।

দিল্লীতে একটিও আসন না পেলেও সবকটি কেন্দ্রেই তাদের দ্বিতীয় স্থান। দিল্লীতে গত বিধানসভার তুলনায় ভোট বেড়েছে তাদের।

দলটা নতুন, তাই দেশজুড়ে শক্তপোক্ত সংগঠন নেই, বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থীরাও ছিল একদম নতুন আর অপরিচিত মুখ। সারা দেশে বেশি ভোট না পাওয়ার এটাও একটা কারণ। এদের মূল এজেন্ডা ছিল দুর্নীতি। জনমানসে দুর্নীতি-বিরোধী ব্যতিরেকে অন্য কোনো ধারণা তৈরি হয়নি এদের ব্যাপারে। কোনো বৃহত্তর বিকল্পের সন্ধানও দেয়নি তারা, যা তাদের মানুষের ভরসার জায়গা করে তুলতে পারে।

অবশ্য নতুন একটি পার্টির পক্ষে সংসদে ৪টি আসন খুব কম কথা নয়। সারা দেশে তারা পেয়েছে মোট ভোটের ২ শতাংশ। সংখ্যাটি ডিএমকে, বিজেডি, আরজেডি-র মতো পাকাপোক্ত সংসদীয় দলগুলির তুলনায় বেশি, সিপিআই(এম) ছাড়া অন্য সব বাম দলের তুলনায়ও বেশি।

'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট'

আমাদের দেশে নির্বাচনী ব্যবস্থার একটি সমস্যা হলো 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট', অর্থাৎ প্রতিটি কেন্দ্রে যে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে, সে ভোট প্রদত্ত ভোটের এক-তৃতীয়াংশই হোক বা এক-চতুর্থাংশ, সে হবে জয়ী। বাকি ভোটারদের কোনো প্রতিনিধি থাকল না। একদিকে ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে 'ঐতিহাসিক জয়' ঘটে বিজেপি-র, সংসদে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যায়। অন্যদিকে প্রাপ্ত ভোটের হিসেবে তৃতীয় হয়েও সংসদে কোনো প্রতিনিধি রইল না বহুজন সমাজ পার্টির।

আর এই ফার্স্ট হওয়ার জন্য দৌড়তে গিয়ে সংসদীয় দলগুলি প্রশাসনকে অপব্যবহার করে, টাকার খেলা চলে, চলে দলীয় সন্ত্রাস। এসবই ক্রমবর্ধমান। এগুলি স্বাভাবিকভাবেই গণতন্ত্রকে পঙ্গু করে তোলে। ফার্স্ট হওয়ার জন্যই যত শক্তিপ্রয়োগ, টাকার খেলা। তাই মতাদর্শ বা সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের বদলে পুঁজিপতিদের টাকার খেলা (সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে মতামত নিয়ন্ত্রণও বটে) হয়ে দাঁড়ায় মুখ্য।

পরিশেষে বলতে হয়, নির্বাচন যেমন সাধারণ মানুষের জন্য আর প্রায় কিছুই নিয়ে আসে না, এই নির্বাচনও একদিক থেকে তাই। কিন্তু অন্য দিক থেকে একটি খোলাখুলি দক্ষিণপন্থী দল, একটি খোলাখুলি হিন্দু মৌলবাদী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতায় আসাটা জনগণের জন্য ভীতিপ্রদ। এর পর কী হবে? শাসক আর শাসিতের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলতেই থাকবে। কখনো কখনো ফ্যাসিস্ট শক্তি একপা এগিয়ে গেলেও শেষ কথা বলবেন জনগণই।

হিন্দমোটরে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক : দায়ী কে?

৬ পৃষ্ঠার পর

২৮৫ কোটি টাকা পেল সরকারি বদান্যতায়, আর তার কোন টাকাই প্রায় খরচা করলো না পুনরুজ্জীবন বা কর্মীদের বকেয়া দেওয়ার স্বার্থে। ৭ বছরের মেয়াদও শেষ হয়েছে এক বছর আগেই। শ্রমিকদের একটি ইউনিয়ন এখনও ২০০১ থেকে ২০০৭ অবধি বকেয়া ডিএ-র মামলা ট্রাইবুনালে চালাচ্ছে। বিগত বামফ্রন্ট সরকার তাদের বানানো আইন ও তার শর্ত রক্ষার্থে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১২ সালে কর্তৃপক্ষের কাছে ঐ জমি বাবদ বিগত সরকারের আদায়ীকৃত ক্ষতিপূরণ (১০-৫০ কোটি) যথেষ্ট নয় বা সেই বাবদ রাজ্য সরকারের ন্যায্য প্রাপ্য ১৯০ কোটি টাকার দাবিতে সোচ্চার। সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক ঘোষণা করার পরেও কারখানা বা শ্রমিকদের বিষয়ে সরকার যত না চিন্তিত তার থেকে বেশি সোচ্চার ঐ ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রথম কিস্তির ২৫ কোটি টাকা আদায় করতে।

আসলে হিন্দুস্থান মোটর্স কর্তৃপক্ষ, সরকার ও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া হিন্দমোটরের শ্রমিকদের বা শিল্পকে বাঁচানোর বিষয়ে তারা সকলেই উদাসীন ছিলেন, আছেন। বিশেষত বাম জমানায় হিন্দমোটর কর্তৃপক্ষ ৩১৪ একর জমি বেচে প্রাপ্ত ২৮৫ কোটি টাকার কোন অংশই কারখানার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করেনি। বর্তমান সরকার তাদের প্রাপ্য প্রথম কিস্তির ২৫ কোটি আদায়ের জন্য যতটা ব্যগ্র, ততটা ব্যগ্র নয় কারখানায় উৎপাদন শুরু করার জন্য। হিন্দমোটর আবার তার স্বমহিমায় ফিরবে, নাকি ডানলপ-জেসপ্-এর মতো খণ্ডহরে পরিণত হবে তা সম্ভবত কোটি টাকার প্রশ্ন।

সংসদীয় নির্বাচন ও গণতন্ত্র

পার্থ সারথি

এ বছর ভারতবর্ষে ১৬তম লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। বিপুল সংখ্যক আসন জিতে নতুন প্রধানমন্ত্রী সংসদে প্রবেশ করলেন। প্রবেশের পথে সংসদের সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললেন, 'এটা গণতন্ত্রের মন্দির, সেজন্যই আমার মতো গরিব ঘরের সন্তানও এখানে প্রবেশ করতে পেরেছে।' আবেগাপ্লুত প্রচারমাধ্যম সামান্য চা-বিক্রেতা এক বালকের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠার অসামান্য কাহিনী ইতিমধ্যেই দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছে। গণতন্ত্রের অপার মহিমা তো বটেই। কিন্তু প্রচারের এই ঢক্কানিনাদে চাপা পড়ে যায় অনেক বাস্তব তথ্য, যা গণতন্ত্রের ধারক-বাহক সংসদ আসলে 'গণতন্ত্রের মন্দির' না ভ্রষ্টাচারের পীঠস্থান এই প্রশ্ন তুলে দিতে পারে। প্রশ্ন তুলতে পারে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধিত্বের অতিকথা নিয়েও।

সংখ্যাগরিষ্ঠতার কল্পকথা

এই নির্বাচনের ফলাফল থেকে দেখা গেল, প্রদত্ত ভোটের মাত্র ৩১ শতাংশ পেয়ে বিজেপি বিপুল সংখ্যক আসন জিতে তথাকথিত 'বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা' লাভ করেছে। সামান্য অংক কষলেই দেখা যাবে, এই দেশজোড়া নির্বাচনে যেহেতু ৬৬.৪ শতাংশ বৈধ ভোট পড়েছে, এবং তার মধ্যে ৩১ শতাংশ বিজেপি নামক দলটির কপালে জুটেছে, তাই হিসেবমতো এই দলটি মোট ভোটদাতাদের মাত্র ২০ শতাংশের কিছু বেশি সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। তার মানে দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ বিজেপি নামক দলটিকে সমর্থন করেননি। অর্থাৎ ২০ শতাংশের সমর্থনপুষ্ট একটা দল ও তার নেতা। বাকি ৮০ শতাংশ দেশবাসী, যারা এই দল বা তার নেতাদের সমর্থন করেননা, তাদের ওপরে আগামী পাঁচ বছর শাসন চালাবার বৈধতা অর্জন করলো এই নির্বাচন মারফত।

শুধু ভোটদাতাদের হিসেব ধরলেও দেখা যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে তো প্রায় ৭০ শতাংশ এই শাসক দলটির প্রতি স্পষ্ট বিরোধিতাই ব্যক্ত করেছেন। তাহলে দেশের লোকসভা বা সংসদ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতিনিধিত্ব-মূলক কোনো সরকার উপহার দিতে পারলো কি? নাকি সংখ্যাগুরু মানুষের ওপর সংখ্যাল্প-জনমতের প্রতিনিধিত্বকারী একটি দল ও তার নেতার শাসন চাপিয়ে দিল? এটাকেই নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে হাওয়া, ঝড়, এমনকি সুনামি বলে প্রচার চালাচ্ছে কর্পোরেট-চালিত মিডিয়া।

মজার ব্যাপার হলো, সংখ্যাল্প মানুষের রায় নিয়ে দেশের ভাগ্য-বিধাতা বনে যাওয়াটা শুধু মোদীজীর বিশেষ সৌভাগ্য, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। স্বাধীনতার পর থেকে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই যারা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, বা যেসকল শাসক দল বা বিভিন্ন দলের জোট ক্ষমতায় এসেছে, তারা এমনই সংখ্যালঘু মানুষের ভোট পেয়ে ক্ষমতায় এসেছে। এবং প্রতিবারই এই সংখ্যালঘু শাসনকে জনাদেশ বা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলে বিপুলভাবে প্রচার করা হয়েছে সরকারি বা বেসরকারি সমস্ত রকম মিডিয়ায়। ক্ষমতাতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হবে তো! ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইট[১] থেকে আমরা ১৯৫১ সাল থেকে প্রতিটি লোকসভা নির্বাচনে কত শতাংশ ভোট পড়েছে, তার মধ্যে শাসক দলের পাওয়া ভোটের শতাংশ এবং জেতা আসন সংখ্যা পাচ্ছি। এবার মোট ভোটারের কতো শতাংশ শাসক দল পেল সেটা একটু হিসেব করে পরের পৃষ্ঠার সারণিতে দেওয়া গেল।

সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৫১ সালে এই সংসদীয় ব্যবস্থার গোড়াপত্তন থেকে এযাবৎ কোনো দল এমনকি প্রদত্ত ভোটের হিসেবেও গরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন পায়নি। অর্ধেকের বেশি আসন জয় করলেও অর্ধেকের বেশি ভোটদাতার সমর্থন কখনই পায়নি। আর মোট ভোটারের অনুপাতে এদেশের প্রতিটি সরকারই একেবারে ডাহা সংখ্যালঘু বা অল্পমতের সরকার বলে পরিগণিত হবে। এযাবৎ শাসক দলগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ভোট পেয়েছিল কংগ্রেস দলটি ১৯৮৪ সালে। ইন্দিরা গান্ধী নিহত হবার পর সহানুভূতির হাওয়ায় সেবার কংগ্রেস প্রদত্ত ভোটের ৪৯ শতাংশ পেয়েছিল, মোট ভোটারের হিসেবে ৩১ শতাংশ ভোটারের সহানুভূতি আদায় করতে পেরেছিল। এছাড়া এপর্যন্ত প্রতিটি লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বা অন্য শাসক দলগুলো মোট ভোটারের প্রেক্ষিতে হিসেব করলে মাত্র ২০-২৫ শতাংশ মানুষের সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন হয়েছে।

অর্থাৎ বৈধ ভোটারদের এক-পঞ্চমাংশ বা এক-চতুর্থাংশের সমর্থনকে সম্বল করে একের পর এক শাসক এই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেছেন। যেহেতু তাঁরা জানেন যে সংখ্যাগুরু মানুষ তাঁদের সমর্থন করেননি, তাঁরা বহুমতের ভিত্তিতে সরকার বানাতে পারেননি, তাই ক্ষমতায় বসেই তাঁরা বিরোধী জনমতকে দমন করার জন্য একের পর এক দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেছেন, বিনা বিচারে আটক আইন চালু করে হাজার হাজার সরকার-বিরোধী মানুষকে জেলে পুরেছেন, ঠাণ্ডা মাথায় অগুনতি মানুষকে হত্যা করেছেন, কয়েকটি জাতিসত্তার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের আন্দোলন দমন করতে সেনাবাহিনীকে বিশেষ ক্ষমতা আইন মারফত মানুষ খুনের লাইসেন্স দিয়ে মুক্তিকামী জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন (যার প্রতিবাদে আমাদের লৌহ-মানবী মণিপুরের শর্মিলা চানু আজ একযুগ ধরে অনশন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন)। এমনকি তাঁদের বিরোধী দল পরিচালিত বহু রাজ্য সরকারকে ভেঙ্গে দিতেও দ্বিধা করেননি

নির্বাচনের সাল	কতো শতাংশ ভোট পড়েছে	প্রদত্ত ভোটের মোট কতো শতাংশ শাসক দল পেয়েছে	শাকসদল কতগুলো আসন পেয়েছে	শাসক দল মোট ভোটারের কতো শতাংশ ভোট পেয়েছে
১৯৫১	৪৪.৮৭	৪৪.৯৯	৩৬৪	২০.২
১৯৫৭	৪৫.৪৪	৪৭.৭৮	৩৭১	২১.৭
১৯৬২	৫৫.৪২	৪৪.৭২	৩৬১	২৪.৭৭
১৯৬৭	৬১.০৪	৪০.৭৮	২৮৩	২৪.৮৮
১৯৭১	৫৫.২৭	৪৩.৬৮	৩৫২	২৪.১৫
১৯৭৭	৬০.৪৯	৪১.৩২	২৯৫	২৪.৯৮
১৯৮০	৫৬.৯২	৪২.৬৯	৩৫৩	২৪.৩
১৯৮৪	৬৩.৫৬	৪৯.১	৪০৪	৩১.১৪
১৯৮৯	৬১.৯৫	ভিপি সিং পরিচালিত সংখ্যালঘু সরকার, পুরো আয়ুষ্কাল টেঁকেনি		
১৯৯১	৫৬.৭৩	৩৬.২৬	২৩২*	২০.৬
১৯৯৬	৫৭.৯৪	একের পর এক সংখ্যালঘু সরকার, কেউ আয়ুষ্কাল পুরো করতে পারেনি		
১৯৯৮	৬১.৯৭	৪০.৭১	২৯৯	২৫.২২
২০০৪	৫৮.০৭	৩৫.৪	২১৮*	২০.৫৬
২০০৯	৫৮.২১	৩৭.২২	২৬২*	২১.৬৫
২০১৪	৬৬.৪	৩১	২৮২**	২০.৫৮

* ১৯৯১, ২০০৪ ও ২০০৯ সালে সংখ্যালঘু সরকার তৈরি হয়। কংগ্রেস পরিচালিত এই সরকারগুলোকে কয়েকটি দল বাইরে থেকে সমর্থন দিয়ে টিকিয়ে রাখে। সারণীতে ১৯৯১-এর হিসেব শুধু কংগ্রেস দলের প্রাপ্ত ভোট ও আসন নিয়ে, আর ২০০৪ ও ২০০৯-এর ক্ষেত্রে ইউপিএ জোটের প্রাপ্ত ভোট আর আসনের হিসেব দেওয়া হয়েছে।
** ২০১৪-র নির্বাচনে বিজেপি জোট বানিয়ে লড়াই করলেও, এই দল যেহেতু একাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, তাই এখানে শুধু বিজেপি-র ভোটের হিসেবই দেওয়া হল।

আসলে সংখ্যালঘু এই কেন্দ্রীয় শাসকরা।

এই জনবিরোধী শাসকদের অগুনতি অপরাধের তালিকায় সর্বশেষ যুক্ত হলো নয়া উদারনীতি গ্রহণ করে দেশের সম্পদ বিদেশি পুঁজির লুণ্ঠনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার কালা ইতিহাস। কংগ্রেস এই নীতির উদগাতা হলেও মোদী সরকার এব্যাপারে মনে হয় পূর্বতন সরকারগুলোকে টেক্কা দেবে। এদের অপরাধের তালিকা বানানো এই লেখার উদ্দেশ্যে নয়, উদ্দেশ্য এদেশে গণতন্ত্রের নামে যে মিথ্যার বেসাতি চলে, সেটা ফাঁস করা। এই শাসকরা কোনদিন বহুমত পায়নি, এরা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি নয়, মিথ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফানুস উড়িয়ে এরা দেশের সর্বনাশ করে চলেছে, তথাকথিত 'গণতন্ত্রের মন্দির'-কে ব্যবহার করছে দেশি-বিদেশি ধনকুবেরদের স্বার্থে। আর তার বিনিময়ে নিজেরা কী পাচ্ছেন? এবার সেই ছবি আমরা দেখবো এই তথাকথিত জন-প্রতিনিধিদের তথা রাজনীতির কারবারীদের ফুলে-ফেঁপে ওঠার খতিয়ানে।

সংসদ না কোটিপতিদের ক্লাব!

প্রথমে দেখা যাক, এই ২০১৪ সালের নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হলেন, তাঁরা কোন্ শ্রেণীর মানুষ। আমরা যদি আমাদের জনসাধারণকে গরিব, মধ্যবিত্ত ও ধনী এই তিন ভাগে ভাগ করি তাহলে এই নির্বাচিত সাংসদরা কোন ভাগে পড়বেন? আমি বলবো, কোন ভাগেই নয়। আমরা যে ধনীদের চিনি-জানি, তাঁদের থেকে এই সাংসদরা আরো অনেক অনেক বেশি ধনী। এরা হচ্ছেন নব্য অতি-ধনী শ্রেণীর মানুষ, যাদের হাতে ১ মিলিয়ন ডলার বা ৫.৫ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগযোগ্য সম্পত্তি আছে। ওয়ার্ল্ড ওয়েলথ রিপোর্ট (WWR) অনুযায়ী ২০১২ সালে ভারতে এদের সংখ্যা ছিল ১,৫৩,০০০ এবং সেই সংখ্যাটা দ্রুত বেড়ে চলেছে।[২] রাজনীতির কারবারিরা যে হারে তাঁদের সম্পদ বাড়িয়ে চলেছেন, সেটা অন্য যে কোনো পেশায় অবিশ্বাস্য ঠেকবে। বিশ্বাস হচ্ছে না? আসুন, তাঁদেরই পেশ করা তথ্য দিয়ে এই তথাকথিত দেশনেতাদের সাম্প্রতিক শ্রী-বৃদ্ধির খতিয়ানটা দেখি।

সুপ্রিম কোর্টের এক রায় অনুযায়ী, ২০০৩ সাল থেকে প্রতিটি নির্বাচনে প্রত্যেক প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ফৌজদারী মামলা থাকলে সে সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করাটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেই বিধি অনুযায়ী, ২০১৪ সালে যেসব সাংসদ নির্বাচিত হলেন তাঁরা যে হিসেব পেশ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে তাঁদের সম্পদের পরিমাণ গড়পরতা ১৫.৪ কোটি টাকা। এই লোকসভা নির্বাচনে মোট ৮১৬৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তাঁদের ২৭ শতাংশ ছিলেন কোটিপতি এবং তাঁদের ১৭ শতাংশের বিরুদ্ধে আদালতে ক্রিমিনাল কেস ঝুলে ছিল।

এই নির্বাচনে যারা প্রার্থী হয়েছিলেন, তাদের সম্পদের পরিমাণ ছিল গড়পরতা ৪.৯ কোটি টাকা। এদের মধ্যে কংগ্রেস যে ৪৬১ জনকে প্রার্থী করেছিল, তাঁদের গড়পরতা সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৩.২৭ কোটি টাকা আর বিজেপি-র ৪২৬ জন

প্রার্থীর গড়পরতা সম্পদ ঝিল ১০.৩২ কোটি টাকা।[৩] কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিতলেন কারা? দেখা গেল, যাদের সম্পদ গড়পরতা প্রার্থীদের থেকে প্রায় তিনগুণ বেশি, এমনকি কংগ্রেস ও বিজেপি-র প্রার্থীদের গড়পরতা সম্পদের তালিকায় যাদের স্থান ওপরের দিকে, তাঁদের মাথাতেই জয়ের মুকুট উঠলো। অর্থাৎ যারা এই নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁরা সাধারণভাবে বিপুল সম্পদশালী হলেও, তাদের মধ্যে আবার যারা অতি সম্পদশালী তাঁরাই নির্বাচনে জয়লাভ করতে পেরেছেন। এর আগের লোকসভা নির্বাচনে অর্থাৎ ২০০৯ সালে নির্বাচিত সাংসদদের গড়পরতা সম্পদ ছিল ৫.৩ কোটি টাকা।[৪] তার মানে বলা যায়, এবারের লোকসভার সদস্য হিসেবে তাঁরাই নির্বাচিত হলেন, যারা বিগত লোকসভার সদস্যদের থেকে তিনগুণ বেশি সম্পদের মালিক।

এতো ধনী ব্যক্তিরা রাজনীতির ময়দানে কেন? কারণ রাজনীতি তাঁদের সম্পদকে দ্রুতহারে বাড়িয়ে দিতে পারে। সেটা বোঝা যাবে নতুন সাংসদদের মধ্যে যারা পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের সম্পদ বৃদ্ধির খতিয়ান দেখলেই। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে যারা জয়লাভ করেছিলেন, এবছর তাঁদের মধ্যে ১৭১ জন পুনরায় জিতে 'গণতন্ত্রের মন্দিরে' প্রবেশ করলেন। এদের মধ্যে ১৬৫ জনের নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করা সম্পদের খতিয়ান দেখাচ্ছে (বাকিদের প্রদত্ত তথ্য অসম্পূর্ণ রয়েছে) এদের ব্যক্তিগত সম্পদ ২০০৯ সালে গড়পরতা ৫.৩৮ কোটি টাকা থেকে গত পাঁচ বছরে বেড়ে হয়েছে ১২.৭৮ কোটি টাকা। মানে পাঁচ বছরে প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি। রিপোর্টে জানানো হয়েছে, এই পুনর্নির্বাচিত সাংসদদের মধ্যে ৭১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে এখনও নানাবিধ ফৌজদারি মামলা ঝুলছে।[৫] আর এবার যারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন, তারা কেমন ধনী? নির্বাচনের আগে পেশ করা নথি অনুযায়ী, তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল গড়পরতা ১৩.২ কোটি টাকা।[৬] এটা আগামী পাঁচ বছরে কী হারে বাড়ে সেটাই এখন দেখার।

সুতরাং এই সাংসদ ও মন্ত্রীরা যে অতি ধনী শ্রেণীতে পড়েন (দু-একজন ব্যতিক্রমী থাকতেই পারেন) এবং এই শ্রেণীর স্বার্থেই যে তাঁরা আগামী পাঁচ বছর কাজ করবেন, সেটা নির্বাচনের ফল বেরোনোর সাথে সাথে শেয়ার বাজারের চাঙ্গা ভাব দেখে স্পষ্ট হয়ে গেছে। শুধু মোদী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন, নির্বাচন-পরবর্তী সমীক্ষার এই ফলাফল দেখেই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতের বাজারে ১২৬৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে। শেয়ার বাজারে খুশির বন্যা বয়ে যায়। এসব দেখে বলা যায়, এই নির্বাচনে শুধু কিছু অতি-ধনী ব্যক্তি জিতলেন তাই নয়, জয় হল পুঁজিবাদের, বিশ্ব-পুঁজির, কর্পোরেট সাম্রাজ্যের। সেজন্যই কর্পোরেট দুনিয়া হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে যেমন নতুন একটা পণ্য বাজারজাত করে, তেমনি করে ভারতের রাজনীতির বাজারে নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর দলকে মার্কেটিং করলো, প্রচারের বন্যায় ভাসিয়ে দিল দেশের জনতাকে। সব মিলিয়ে ভারতের সংসদ এখন নিঃসন্দেহে এখন কোটিপতিদের ক্লাব, আক্ষরিত অর্থেই ভারতীয় গণতন্ত্র এখন কোটিপতিদের জন্য, কোটিপতিদের দ্বারা গঠিত, কোটিপতিদের গণতন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে।

এদেশের সাধারণ মানুষ অবশ্য অনেক আগেও জেনেছেন, রাজনীতি এখন বিনা-পুঁজির ব্যবসা। সেটা যে বর্তমানে বেশ রমরমিয়ে চলছে, তা দেশ-নেতাদের সম্পদের পরিমাণ এবং সম্পদ-বৃদ্ধির প্রবণতা দিয়ে খানিকতা বোঝা যাচ্ছে বৈকি। মনে রাখতে হবে, এই তথ্য হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী যা তাঁরা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। নিজেদের সমস্ত সম্পদের ঠিকঠিক হিসেব পেশ করবেন, সম্পত্তিবান শ্রেণীর মধ্যে এমন সাধু ব্যক্তির যে দেশে অভাব আছে, তা কে না জানে? সুতরাং এইসব নেতা-মন্ত্রীদের অপ্রকাশিত সম্পদ না জানি আরো কতো আছে! গত সংসদ চলাকালীন নেতা-মন্ত্রীদের হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি ধরা পড়েছিল, সেসব টাকার হিসেব কোনোদিন পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বিদেশের ব্যাংকে পাচার করা বিপুল কালো টাকার অনুসন্ধানের জন্য সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, এবং নতুন কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিশেষ অনুসন্ধানকারী দল তৈরি করেছে। কিন্তু এই টাকার একটা বড়ো অংশ যে তথাকথিত এই দেশ-নেতাদের পাচার করা সেটা অনুমান করা খুব দুঃসাধ্য নয়। তাই শেষ অবধি সেই টাকা কতোটা উদ্ধার হবে সেটা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করা তথ্য অনুযায়ী আমাদের নতুন প্রধানমন্ত্রী মাত্র ১.৭ কোটি টাকা সম্পদের মালিক। নব-নির্বাচিত সাংসদদের গড়পরতা সম্পদের পরিমাণ যেখানে ১৫.৪ কোটি টাকা, সেখানে মোদীজীকে বোধহয় গরিবই বলা যায়। কিন্তু এই ভদ্রলোক চা-বিক্রেতা থেকে কীভাবে প্রধানমন্ত্রী হলেন, এটা নিয়ে বিস্তর গল্প ফাঁদা হলো, কিন্তু একজন কপর্দকহীন সঙ্ঘ প্রচারক থেকে যিনি রাজনৈতিক নেতা হলেন, যিনি গতর খাটিয়ে উপার্জন করেননি কোনদিন, পিতৃ-প্রদত্ত সম্পত্তিও নিশ্চয়ই পাননি, তাঁর সম্পদ ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা কীভাবে এলো, কোথা থেকে এলো, সেই প্রশ্ন কেউ তুললেন না। তিনি বলেছেন, তিনি গরীব ঘরের ছেলে হয়েও প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছেন, ভারতীয় গণতন্ত্রের নাকি এমনই মহিমা। তিনি এককালে গরিব ছিলেন ঠিকই, কিন্তু যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে নামছেন, তখন তো তিনি কোটিপতি। সমাজের একেবারে উঁচুতলায় তাঁর অবস্থান, ক্ষমতা এবং সম্পদ দুদিক থেকেই। এদেশে কটা লোক এমন বিশাল সম্পদের মালিক? সুতরাং গরিব থেকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার গল্পে শুধুই ফাঁকি ছাড়া আর কিছু নেই। এভাবেই ভারত রাষ্ট্র প্রচার করে, ধীরুভাই আম্বানি সাধারণ বস্ত্র-বিক্রেতা থেকে বিশাল

শিল্পপতি হয়েছেন, সুতরাং চেষ্টা করো তুমিও পারবে। পুঁজি খাটিয়ে আম্বানি, না হয় বিনা পুঁজিতে মোদী।

নরেন্দ্র মোদী ভোটের আগে নিজেকে অন্যান্য পশ্চাদপদ বর্ণের (ওবিসি) মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। দেখা যাক, তাঁর মন্ত্রিসভায় কতজন পশ্চাদপদ বর্ণের মানুষ ঠাঁই পেলেন? এদেশের জনসংখ্যায় ওবিসি-র পরিমাণ ৪১ শতাংশ, তফসিলি জাতির মানুষ ১৯.৬ শতাংশ, তফসিলি উপজাতির মানুষ ৮.৬ শতাংশ, আর মুসলিম ১৩.৪ শতাংশ।[৭] এইসব সম্প্রদায়ের মানুষ এদেশে আর্থিকভাবে পশ্চাৎপদ ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত। যদিও সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে এরাই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ, মোট জনসংখ্যার ৮২.৬ শতাংশ। বাকি ১৭.৪ শতাংশ উচ্চবর্ণের মানুষ। কিন্তু মোদীজীর নতুন মন্ত্রিসভায় ৪৬ জনের মধ্যে ২০ জন অর্থাৎ ৪৩.৫ শতাংশ হলেন উচ্চবর্ণজাত হিন্দু, ওবিসি ১৩ জন অর্থাৎ ২৮ শতাংশ, তফসিলি জাতি তথা দলিত ৩ জন (৬.৫ শতাংশ), আদিবাসী ৬ জন (১৩ শতাংশ), আর মুসলিম মাত্র ১ জন (২ শতাংশ)। এই হিসেবে একজন শিখ মন্ত্রী, স্মৃতি ইরানি ও মেনকা গান্ধীকে ধরা হয়নি।[৮] যদিও এই সম্প্রদায়গত প্রতিনিধিত্বে বিশেষ কিছু যায় আসেনা, তবু এদেশে সর্ব ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আধিপত্য যে নতুন মন্ত্রীসভার গঠনেও প্রতিভাত, সেটাই উল্লেখ করার।

যে একমাত্র মুসলিম প্রতিনিধি মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন, সেই নাজমা হেফাতুল্লা সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতর হাতে নিয়েই বলেছেন, মুসলিমদের তিনি সংখ্যালঘু বলে মনে করেন না। তাঁর মতে, বরং পার্শিরা হচ্ছে সংখ্যালঘু, কারণ তাদের জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে, তাই তাঁদের উন্নতির কথা ভাবা দরকার। আমরা জানি, পার্শীরা তুলনামূলকভাবে সম্পদশালী, তো তাঁদের স্বার্থ দেখার জন্য একজন মন্ত্রী কেন দরকার বোঝা গেল না। যেটা জানা গেল তা হচ্ছে, মোদী এবং সঙ্ঘ-পরিবারকে তুষ্ট রাখাই এই ভদ্রমহিলার একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং তিনি কেমন সংখ্যলঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব তথা উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। দলিত বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের যারা মন্ত্রিসভায় এলেন, তাঁরাও এমনই নিজ নিজ জনজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোটিপতি ক্লাবের সদস্য। তাঁদের জাতিগত তকমা প্রথমে ভোট টানার হাতিয়ার হিসেবে কাজে লেগেছে, এখন সরকারের দলিত ও আদিবাসী মুখ হিসেবে কাজে লাগবে। তাঁরা যে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থে কাজ করবেন, এমনটা ভাবা মুর্খামি হবে।

লুঠেরা গণতন্ত্র

আমরা আগেই জেনেছি, ২০০৩ সাল থেকে প্রত্যেক নির্বাচন প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ ও মামলা থাকলে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করাটা বাধ্যতামূলক করা হয়। নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রদত্ত এই তথ্য বিশ্লেষণ করে অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রাটিক রিফর্মস নামক একটি সংস্থা দেখিয়েছে যে[৯], ২০০৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে মোট যতবার সংসদ ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেইসব নির্বাচনে নির্বাচিত মোট ৮৮৮২ জন 'জন-প্রতিনিধি'র ঘোষিত রেকর্ড অনুযায়ী, তাঁদের মধ্যে ২৪৯৭ জন বা ২৮.৪ শতাংশের বিরুদ্ধে ৯৯৯৩টি ফৌজদারি মামলা ঝুলে আছে, যাদের মধ্যে আবার ১১৮৭ (১৩.৫ শতাংশ) জনের বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি, রাহাজানির মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ করার বিষয় হলো, যার বিরুদ্ধে যত বেশি অভিযোগ, তার সম্পদের পরিমাণ তত বেশি। এই সময়কালে (২০০৪-২০১৩) এইসব 'জন-প্রতিনিধি'দের ঘোষিত সম্পদবৃদ্ধির হিসেবটা দেখলে এই প্রজাতন্ত্রে অপরাধকর্মের সাথে রাজনীতির নিবিড় সংযোগ তথা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের ছবিটা স্পষ্ট হয়।

এই রিপোর্ট অনুযায়ী, এই দশ বছরে দেশজুড়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গড়পরতা ঘোষিত সম্পদ ১.৩৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৩.৮ কোটি টাকা। যে সমস্ত নির্বাচিত বিধানসভা বা লোকসভা সদস্যদের বিরুদ্ধে নানাবিধ ফৌজদারি মামলা রয়েছে, এই সময়কালে তাঁদের গড়পরতা সম্পদ বেড়ে হয়েছে ৪.২৭ কোটি টাকা, আর যাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ তাঁদের সম্পদ বেড়েছে সবচেয়ে বেশি হারে— তাঁদের গড়পরতা সম্পদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৪ কোটি টাকায়। অর্থাৎ শুরুতে আমরা সাংসদদের ক্ষেত্রে যে ছবিটা দেখেছি, গোটা দেশজুড়ে সংসদীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই সেটা কমবেশি সত্যি— রাজনীতি নামক কারবারে মূলত ধনী ব্যক্তিরাই সাফল্য পান, এবং তাঁরা এই কারবারে বিনিয়োগ করেন (নির্বাচনের আগে প্রচার এবং ভোট কেনার জন্য) নির্বাচনে জেতার পর তা সুদে-আসলে উশুল করে নেওয়ার জন্যই।

রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সম্পদ-বৃদ্ধির কাজে লাগাতে বাহুবলীরাই যে বেশি পারদর্শী, এই প্রজাতন্ত্রে এটাও একটা 'ওপেন সিক্রেট'। প্রজাতন্ত্রের শৈশবে রাজনীতিবিদরা ক্ষমতা পাওয়া এবং ধরে রাখার জন্য বাহুবলীদের কাজে লাগাতেন, ক্ষমতার রাজনীতিতে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এখন দেশের বহু জায়গাতে বাহুবলীরাই ক্ষমতার অলিন্দে উঠে এসেছেন। প্রজাতন্ত্র যত প্রবীণ হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে পেশী-শক্তির সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়েছে, 'রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন' আরো প্রকট হয়েছে, সংবিধান-বহির্ভূত ক্ষমতার কেন্দ্রগুলো আরো শক্তিশালী হয়ে গণতন্ত্রের মৌলিক শর্তগুলোকেই নস্যাৎ করছে, 'আইনের শাসন'কে প্রহসনে পরিণত করেছে। গণতন্ত্র-হীনতার এইসব দিক অবশ্য পৃথক আলোচনার বিষয়।

আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রতিপাদ্য হল, যত দিন যাচ্ছে ভারতের রাজনীতিতে সম্পদশালীদের আধিপত্য বাড়ছে

এর পর ৩০ পৃষ্ঠায়

মানব উন্নয়নের আলোকে গুজরাট মডেল

সুমন কল্যাণ মৌলিক

অবশেষে সাঙ্গ হল পৃথিবীর 'বৃহত্তম' গণতন্ত্রের মহান উৎসব। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে দিল্লীর মসনদে আসীন হলেন নরেন্দ্র দামোদর মোদি, প্রতিষ্ঠিত হল বহু বিজ্ঞাপিত মোদি সরকার। একথা অনস্বীকার্য যে নরেন্দ্র মোদির সমর্থনে কর্পোরেট মিডিয়া এবং অতি অবশ্যই বিজেপির প্রচারযন্ত্র আসমুদ্র হিমাচল প্রচারের যে ঢেউ তুলেছিল তার একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল 'গুজরাট মডেল'। এই মডেল বলতে সাধারণভাবে বোঝায় যে নরেন্দ্র মোদির রাজত্বকালে গুজরাট এক মডেল রাজ্যে পরিণত হয়েছে যা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত স্থাপন করেছে। কর্পোরেট শাসিত মিডিয়ার আখ্যান অনুযায়ী গুজরাট হল সেই রাজ্য যা নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বগুণে কৃষি, শিল্প, কর্মসংস্থান, পরিকাঠামোতে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে। এই যুক্তিবিন্যাসে একথা পরিষ্কার যে কর্পোরেটরা চায় গোটা ভারতবর্ষে গুজরাট মডেলের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে যাতে গুজরাট নামক 'রামরাজ্য' আসমুদ্র-হিমাচল বিস্তৃত হয়। এই নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির সাফল্যকে অনেকে গুজরাট মডেলের প্রতি জনতার সমর্থন বলে বর্ণনা করেছেন। এই নিবন্ধটির উদ্দেশ্য মানব উন্নয়নের নিরিখে গুজরাট মডেলটিকে হাতে কলমে বুঝে নেওয়া।

উন্নয়ন— একটি মাপকাঠির সন্ধান

নরেন্দ্র মোদির গুজরাটের উন্নতির সুলুক সন্ধান করতে গেলে স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটি উঠবে তা হলো উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? এক্ষেত্রে প্রথম মতটি হল 'উন্নয়ন' মানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উঁচু হার, বেড়ে চলা মাথাপিছু আয়, সেনসেক্সের উল্কা সদৃশ উত্থান, বড়ো বড়ো কারখানা, রাস্তা, ব্রিজ, শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স এবং বিলাসব্যসনের অঢেল উপকরণ। এই মতেরই প্রতিধ্বনি আমরা দেখি মাথাপিছু আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাবনিকাশের দ্বারা উন্নয়নকে মাপতে চাওয়ার প্রবণতার মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় মতটি হলো— উন্নয়ন বলতে বোঝায় সমস্ত মানুষের খাওয়া পরা, মাথার উপরে ছাদ, চিকিৎসা ও শিক্ষার বন্দোবস্ত। এই ধারণাই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায় যখন এই চাহিদার ভিত্তিতে তৈরি মানব উন্নয়ন সূচককে উন্নয়নের মাপকঠি হিসাবে মেনে নেওয়া হয়। উন্নয়ন সম্পর্কিত এই দ্বিতীয় ধারণাটি আরো সমন্বিত রূপ পায় যখন এর মধ্যে উন্নয়নের প্রকৃতি টেঁকসই (sustainable) কিনা, তা সমাজের বিভিন্ন স্তরকে স্পর্শ করেছে কিনা, পুঁজির বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থানের সুযোগকে প্রসারিত করেছে কিনা, সেই উন্নয়নমুখী সমাজে নারী, সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষিত কিনা— ইত্যাদি প্রশ্নগুলিকে যুক্ত করা হয়। গুজরাট মডেলের স্বরূপ সন্ধানের ক্ষেত্রে বর্তমান নিবন্ধটি উন্নয়ন সম্পর্কিত দ্বিতীয় ধারাটিকে অনুসরণ করেছে। আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবেই তুলনা হিসাবে গুজরাটের সমপর্যায়ের রাজ্যগুলির, বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, হরিয়ানার উদাহরণ এসেছে। প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থাগুলি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার আলোকে গুজরাট

শিক্ষা হল এমন একটি আর্থ-সামাজিক সূচক যা মানব উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে আমাদের ভীষণভাবে সাহায্য করে, শিক্ষা সূচকের প্রথম মাপ অবশ্যই সাক্ষরতা। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে সারা ভারতের মধ্যে এবং প্রধান ১৫টি রাজ্যের মধ্যে গুজরাটের স্থান কোথায় তা প্রথমে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

সারণি ১

সাক্ষরতার ক্ষেত্রে গুজরাটের অবস্থান (৬ বছর ও তদূর্ধ্বে)

	সারা দেশে	*১৫টি রাজ্যের মধ্যে*
জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (৫৫তম রাউন্ড : ১৯৯৯-২০০০)	১৯	৫
জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (৬৪তম রাউন্ড : ২০০৬-২০০৮)	২১	৭

সারণি ১ থেকে এটা পরিষ্কার যে মোদির জমানায় সাক্ষরতার হার নিম্নমুখী।

শিক্ষার হালহকিকত মাপার আরেকটি স্বীকৃত উপায় হলো, সমাজের কত শতাংশ মানুষ পড়াশুনার সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে।

সারণি ২

শিক্ষার্থীদের বিচারে দেশে গুজরাটের স্থান (৬-২৯ বছরের মধ্যে)

	সারা দেশে	*১৫টি রাজ্যের মধ্যে*
জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (৫৫তম রাউন্ড : ১৯৯৯-২০০০)	২৩	৯
জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (৬৪তম রাউন্ড : ২০০৬-২০০৮)	৩০	১৪

সারণি ২ থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে গুজরাটের শিক্ষাব্যবস্থা অধোগতি প্রাপ্ত হচ্ছে।

সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গবৈষম্য উন্নয়নের সর্বমুখী (holistic)

হবার দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অন্যভাবে বলা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান লিঙ্গ বৈষম্য প্রমাণ করে যে সেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে মেয়েরা কীভাবে উপেক্ষিত।

সারণি ৩

গুজরাটে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য

	নারী সাক্ষরতা	*পুরুষ সাক্ষরতা*	*লিঙ্গবৈষম্য*
গুজরাট	৬৪.৮০	৮৪.৭৫	২০.০
হরিয়ানা	৬৩.২৪	৮৩.০৩	১৯.৮
মহারাষ্ট্র	৭৩.৬১	৮৮.২৪	১৪.৬
তামিলনাড়ু	৭২.৭৪	৮৮.১৭	১৫.৪

লিঙ্গ বৈষম্য বা সাক্ষরতার প্রশ্নে মহিলাদের কম অংশগ্রহণ — এই মাপকাঠিতে গুজরাট ভারতে লজ্জাজনকভাবে প্রথম।

আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে শিক্ষা যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও মূলত রাজ্যের দায়িত্ব। একটি রাজ্য সরকার শিক্ষার বিস্তার ও মান উন্নয়নের জন্য কতটা আন্তরিক তা বোঝার উপায় সে রাজ্য শিক্ষাখাতে কী ধরনের ব্যয় করছে সেটা দেখা। এক্ষেত্রে 'বিকাশপুরুষ' মোদির জমানায় গুজরাটের অবস্থান ভয়ঙ্কর। ১৯৯০-৯৫ সময় পর্বে রাজ্য বাজেটের ৪.২৫ শতাংশ শিক্ষাখাতে খরচ হত, যা ২০০৫-১০ সময়পর্বে নেমে এসে হয়েছে ০.১১ শতাংশ। সরকারের এই নিদারুণ অবহেলার কারণে আজ গুজরাট শিক্ষাক্ষেত্রে সারা দেশের মধ্যে নেহাতই এক নিচের দিকের রাজ্য। তাই একজন শিক্ষার্থীর গড় বিদ্যালয় জীবন কেরলে যেখানে ১১.৩৩ বছর, সেখানে গুজরাটের মাত্র ৮.৭৯ বছর। ইউএনডিপি প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী গুজরাটের স্কুলগুলিতে স্কুলছুটের (ড্রপ-আউট) পরিমাণ ৫০ শতাংশ।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার আলোকে গুজরাট

মানব উন্নয়ন সূচকের বাস্তবতায় গুজরাটকে মাপতে চাওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার প্রশ্নটিকে আলোচনা করা অনিবার্য। কারণ নাগরিকের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার বিষয়টি উন্নয়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

- জাতীয় স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৩ অনুযায়ী গুজরাটের ৪২ শতাংশ শিশুর ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম। জাতীয় স্বাস্থ্য সমীক্ষা-২ তে পরিমাণটা ছিল ৪৫ শতাংশ।
- সারা দেশে গুজরাট হল সপ্তম রাজ্য যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের বডি মাস ইনডেক্স মাত্র ১৮.৫। (সর্বনিম্ন স্বাভাবিক মান)
- জন্মের সময় শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪৪।
- ইউনিসেফের রিপোর্ট ২০১২ অনুসারে গুজরাটে অনূর্ধ ৫ বছরের ৫০ শতাংশ শিশু অপুষ্টি ও ৭৫ শতাংশ শিশু রক্তাল্পতার শিকার।
- ১২-১৩ মাসের শিশুদের আবশ্যিক টিকাদানে কর্মসূচিতে এই রাজ্যের সাফল্য মাত্র ৪৫ শতাংশ। সারা দেশের মধ্যে স্থান ১৯তম।
- গুজরাটে মাত্র ৫০ শতাংশ শিশু হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করে।

উপরিউক্ত খণ্ডচিত্রটি গুজরাটের স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল-হকিকত সামনে তুলে ধরে। এই পরিসংখ্যানগুলি এই সত্যকে স্পষ্ট করে যে গুজরাটের বহু আলোচিত আর্থিক প্রবৃদ্ধি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর কোন উন্নতি ঘটাতে সমর্থ হয়নি।

সারণি ৪

গুজরাট এবং অন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সূচকের তুলনা (%)

	গুজরাট	*তামিলনাড়ু*	*মহারাষ্ট্র*
পুরুষদের গড় আয়ু	৬২.৯	৬৫.০	৬৫.০
মহিলাদের গড় আয়ু	৬৫.২	৬৭.৪	৬৮.৪
প্রসবকালীন মায়ের মৃত্যু (হাজারে)	৬২.৮	৩৭.৭	৪৫.৩
অপুষ্ট শিশু	৪৯.২	৩১.১	৪৪.০
বাধ্যতামূলক টিকা	৪৫.২	৮০.৯	৫৮.৮

তথ্যসূত্র : ২০০২ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর ও জাতীয় স্বাস্থ্য সমীক্ষা কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য

জন্মকালীন শিশুমৃত্যুর হারটি যে কোন স্বাস্থ্য বিচারের মাপকাঠিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ০-১২ মাসের শিশুরা বিশুদ্ধ পানীয় জল, পুষ্টিকর খাবার, পোশাক, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল। এগুলির অভাব ঘটলে শিশুমৃত্যুর হার বেড়ে যায়, সুলভ হলে শিশুমৃত্যুর হার কমে। কিন্তু সারণি ৪-এর তথ্যগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে এক্ষেত্রে গুজরাট সরকারের পারফরম্যান্স ভয়াবহ।

জন্মকালীন শিশুমৃত্যুর ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের বৈষম্যের অনুপাতে যদি ১-এর বেশি হয় তবে ধরে নেওয়া হয় যে গ্রামের শিশুরা অনেক বেশি অসুবিধাজনক অবস্থায় আছে। কিন্তু সেই অনুপাতে যদি ১-এর কম হয় তবে চিত্রটা উল্টো হয়। গুজরাটে ১৯৯৫-৯৯ সময়পর্বে এই অনুপাত ছিল ১.৫০ যা যথেষ্ট খারাপ, কিন্তু নরেন্দ্র মোদির জমানায় অনুপাতটা আরো বেড়ে হয়েছে ১.৬৮ শতাংশ। অর্থাৎ পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেছে।

স্ত্রী ও পুরুষ শিশুর ক্ষেত্রেও হিসাব একই রকম। শিশুমৃত্যুর ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের অনুপাত যদি ১-এর বেশি হয় তবে স্ত্রী শিশুরা অসুবিধাজনক অবস্থায় আছে, ১-এর কম হলে চিত্রটা উল্টো। ২০০৫-১০ সময়পর্বে গুজরাটে এই অনুপাত ১.০৬, যখন সারা দেশের অনুপাত ১.০৫।

শিক্ষার মত স্বাস্থ্যেরও এই বেসামাল অবস্থার জন্য অন্যতম দায়ী গুজরাট সরকারের পলিসি। গুজরাটে ১৯৯০ থেকে ২০১০— এই বিরাট সময়ে মোট ব্যয়বরাদ্দের তুলনায়

স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম। অবাক হলেও সত্যি যে গুজরাট সরকার তার মোট ব্যয়বরাদ্দের মাত্র ০.৭৭ অংশ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করে। এমনকি বিহার ও ওড়িশার মতো তথাকথিত পিছিয়ে পড়া রাজ্যও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করে যথাক্রমে ১.০১ শতাংশ এবং ১.৬৬ শতাংশ। তাই স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে গোটা দেশে গুজরাটের স্থান একেবারে পেছনের সারিতে।

জনকল্যাণের অবনমন — আরো কিছু তথ্য

শুধু স্বাস্থ্য, চিকিৎসা পরিষেবা বা শিক্ষা নয়, নাগরিকের বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যূনতম পরিষেবা দেওয়া সরকারের আবশ্যিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, সেগুলির ক্ষেত্রেও গুজরাটের মোদি সরকারের ভূমিকা আশাপ্রদ নয়। বরং ধারাবাহিক অনুসন্ধানে এটা দেখা যাবে যে নব্য-উদারবাদী আর্থিক পলিসির প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা যত বেড়েছে, ঠিক তেমনি পাল্লা দিয়ে কমেছে জনকল্যাণ খাতে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ। নিচের তথ্যগুলি এ ব্যাপারে আলোকপাত করবে।

- মানব উন্নয়ন সূচক মোতাবেক সারা দেশের মধ্যে গুজরাটের স্থান একাদশ।
- পরিবেশ মন্ত্রক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ভারতের ৮৮টি সবচেয়ে দূষিত শিল্পাঞ্চলগুলির মধ্যে ৮টি গুজরাটে।
- গুজরাটে ৬৭ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের কোন শৌচালয় নেই। শৌচালয়ের সংখ্যার বিচারে সারা দেশে গুজরাটের স্থান দশম।
- গুজরাটের গ্রামীণ পরিবারগুলির মধ্যে ৪৩ শতাংশের নিজের বাড়িতে জলের সংযোগ রয়েছে। ১৬.৭ শতাংশ পানীয় জল পায় কমন ট্যাপের মাধ্যমে। বাকিদের পানীয় জলের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা নেই।
- বিশ্ব ক্ষুধা সূচক অনুযায়ী পৃথিবীর ৮৮টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৬৬। তারই মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যে ৫টি রাজ্যের, তার মধ্যে একটি গুজরাট।
- গুজরাটে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাত ১০০০ : ৯১৮। সারা দেশের মধ্যে এই নিরিখে গুজরাটের স্থান ২৪তম।

এই সামগ্রিক অবনমনের প্রধান কারণ জনকল্যাণ খাতে সরকারের উপর্যুপরি ব্যয় হ্রাস। এই ব্যয় হ্রাসের প্রধান কারণ গুজরাট সরকারের শোচনীয় আর্থিক অবস্থা। নরেন্দ্র মোদি জনকল্যাণের হাজারো প্রকল্প যতই ঘোষণা করুক না কেন, ৯০'এর দশকের শুরু থেকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো গুজরাটও জনকল্যাণ খাতে ব্যয়বরাদ্দ কমিয়ে চলেছে। শিল্পায়নের নামে কর্পোরেট পুঁজির মৃগয়াক্ষেত্রে হিসাবে রাজ্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গুজরাটকে যেসব ছাড় দিতে হচ্ছে তার ফলে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হচ্ছে।

দারিদ্র্য ও অসাম্যের বিচারে গুজরাট

ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি) অনুসারে আর্থিক বৃদ্ধি কখনই দারিদ্র্য কমাতে পারে না, যদি না তা সর্বস্পর্শী হয়, স্থানীয় স্তরে যদি না তা গ্রাম ও শহর এলাকা এবং সর্বস্তরের মানুষকে স্পর্শ করতে পারে। এই জায়গাগুলোতে উন্নয়নের সুফল পৌঁছানোর উপর দারিদ্র্য ও অসাম্য কমার বিষয়টি নির্ভর করে। তাই দারিদ্র্য ও অসাম্যের মাপকাঠিতে গুজরাট মডেলের সার্থকতা বিচার জরুরি হয়ে ওঠে।

সারণি ৫

বিভিন্ন রাজ্যে দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা জনসংখ্যা

রাজ্যের নাম	*জনসংখ্যার শতাংশ*
গুজরাট	৩১.৮
অন্ধ্রপ্রদেশ	২৯.৯
তামিলনাড়ু	২৯.৮
কেরালা	২৯.৭

তথ্যসূত্র : www.indianexpress.com

সারণি ৬

জনপ্রতি গড় বার্ষিক আয় (২০১১)

রাজ্য	*আয় (টাকা)*
গুজরাট	৬৩,৯৯৬
হরিয়ানা	৯২,৩২৭
মহারাষ্ট্র	৮৩,৪৭১
তামিলনাড়ু	৭২,৯৯৩

তথ্যসূত্র : ভারত সরকারের আর্থিক সমীক্ষা : ২০১১

গুজরাটে দারিদ্র্যের খতিয়ানটিকে যদি বিভিন্ন সামাজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে যে দারিদ্র্যের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি আদিবাসী মানুষদের মধ্যে, যারা মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৩-৯৪ সালে গুজরাটে যখন গ্রামীণ দারিদ্র্যের পরিমাণ ছিল ৪৩.২৯ শতাংশ, তখন আদিবাসীদের মধ্যে দারিদ্র্যের পরিমাণ ছিল ৫৩.২৪ শতাংশ। ২০০৪-০৫ সালে যখন গ্রামীণ দারিদ্র্যের পরিমাণ ছিল ৩৯.০৯ শতাংশ, তখন আদিবাসীদের মধ্যে দারিদ্র্যের পরিমাণ ছিল ৫৭.০৭ শতাংশ। ২০০৯-১০ সালে যখন গ্রামীণ দারিদ্র্যের পরিমাণ ২৬.৬৩ শতাংশ, তখন আদিবাসী দারিদ্র্যের পরিমাণ ৪৮.৫৭ শতাংশ।

উপরিউক্ত পরিসংখ্যানগুলি থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে নরেন্দ্র মোদির বহু বিজ্ঞাপিত গুজরাট মডেল দারিদ্র্য ও অসাম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে কোন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেনি। বরং নয়া উদারবাদী অর্থনীতির ব্যাকরণ মেনে

সামাজিক ও আর্থিক অসাম্য আরো বৃদ্ধি করেছে।

প্রসঙ্গ মুসলমান

নরেন্দ্র মোদির গুজরাট সংক্রান্ত আলোচনায় অনিবার্যভাবে উঠে আসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করে মুসলমানদের কথা। যেহেতু গোধরা কাণ্ড পরবর্তী দাঙ্গা বা গণহত্যায় কয়েক হাজার মুসলমানের হত্যা, পাশবিক অত্যাচার অস্বীকার করার কোন রাস্তা নেই, তাই সম্প্রতি মোদি সমর্থকরা সুপরিকল্পিতভাবে এক প্রচার শুরু করেছেন, যার মূল কথা— গোধরা কাণ্ড আজ অতীত। গুজরাটের মুসলমানরা বর্তমান সময়ে মোদির মধ্যে তাদের প্রকৃত নেতাকে খুঁজে পেয়েছেন, মুসলমানরা আজ মোদির উন্নয়ন মঞ্চের শরিক। এই দাবিকেও বাস্তবতার নিরিখে বিচার করা উচিত।

গুজরাটের মোট জনসংখ্যার ৯ শতাংশ মুসলিম। গুজরাটে সংবিধান স্বীকৃত নিজের পছন্দ মতো ধর্মাচরণের অধিকারকে রীতিমতো লঙঘন করে নরেন্দ্র মোদি 'Gujrat Freedom of Religion Law 2003' পাশ করান, যেখানে বলা হয় এখন থেকে গুজরাটে কোন ব্যক্তি যদি ধর্মান্তরিত হতে চায় তবে রাজ্য সরকারের অনুমতি বাধ্যতামূলক।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি মাধ্যমিক বৃত্তি রয়েছে। গুজরাটে ৫৫,০০০ সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এই বৃত্তি এসেছিল। কিন্তু মোদির নির্দেশে মোতাবেক এই বৃত্তি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতরণ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

নরেন্দ্র মোদির জমানায় গুজরাটের মুসলমানরা কী অবস্থায় আছেন— তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে করেছেন সাচার কমিটির সদস্য, বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আবু সালে শরিফ। ২০১১ সালে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমির রিসার্চের (NCAER) পক্ষ থেকে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনের তথ্যসূত্র হল জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, সাচার কমিটির রিপোর্ট এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার দেওয়া তথ্য। রিপোর্টের কিছু অংশ নিচে দেওয়া হলো—

- গুজরাটে শহুরে মুসলমানদের মধ্যেকার দারিদ্র্যের পরিমাণ শহরে বসবাসকারী উচ্চবর্ণের হিন্দুদের থেকে ৮০ শতাংশ বেশি, দলিত ও আদিবাসী হিন্দুদের থেকে ৫০ শতাংশ বেশি। মনে রাখতে হবে মুসলিমদের মধ্যে ৬০ শতাংশ শহরে বাস করে এবং তারাই গুজরাটের সবচেয়ে বঞ্চিত সামাজিক গোষ্ঠী।

গুজরাটে ন্যানো

গুজরাট সরকারের টাটা ন্যানো প্রকল্পে ভরতুকির পরিমাণ (২০১৩-১৪) ২৭৩.৪৫ কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় ভ্যাট-এ ছাড় : ৩৮২ কোটি টাকা সুদহীন ঋণ : ৯৭৫০ কোটি টাকা (টাটার সমগ্র লগ্নির ৩.৩ গুণ)

- গুজরাটে মুসলমানদের শিক্ষার হাল খুব খারাপ। মুসলিম শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ২৬ শতাংশ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোতে পারে। অন্তত ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণীর পর থেকে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়।
- কর্মসংস্থানের দিক থেকে দেখতে গেলে গুজরাটের মুসলমানদের একটা বড়ো অংশ স্বনিযুক্ত ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। গত দুই দশকে এদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়নি বললেই চলে।
- গুজরাটের মুসলমানদের মধ্যে মাত্র ১২ শতাংশের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, তার মধ্যে মাত্র ২.৬ শতাংশ ঋণের সুবিধা পায়।

তাই বলা যায় পরিকল্পনা মাফিক মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা বা আর্থিক-সামাজিক প্রক্রিয়া থেকে বিযুক্ত করার কাজ গুজরাটে আজ সম্পূর্ণ।

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ মানব উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে গুজরাট নেহাৎই এক পিছিয়ে পড়া রাজ্য। মোদির দাবি করা গুজরাটের আম-আদমির সমৃদ্ধির ছবির সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। এর প্রধান কারণ, আগেই বলেছি, জনকল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রেগুলিতে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে হ্রাস। শিল্পায়নের নামে কর্পোরেট পুঁজির মৃগয়াক্ষেত্র হিসাবে রাজ্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ক্রমাগত কর ছাড়, অন্যদিকে রাজ্যের আর্থিক ঘাটতি মেটাতে গিয়ে চড়া সুদে বাজার থেকে টাকা তোলা— দেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে গুজরাট একই বন্ধনীভুক্ত। বরং বলা যায় জনকল্যাণ খাতে ব্যয়বরাদ্দ কমানোর ক্ষেত্রে গুজরাট দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে। উন্নয়নের মাপকাঠিতে আরো দেখা যাচ্ছে যে সমাজের অনগ্রসর অংশগুলি, যেমন দলিত, আদিবাসী ও মুসলমানদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা শোচনীয়, বিশেষ করে মুসলমানদের পরিকল্পিতভাবে আর্থিক-সামাজিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। ফলে লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির জয়লাভের পরেও একথা নিশ্চিত করে বলা যায় গুজরাট মডেল কখনই ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য বিকল্প হতে পারে না।

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে
আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর
৯৮৩০৯২২১৮৪ বা ৯৩৩১০১২৫৩৭

নির্বাচন : ২০১৪

জনসংঘ থেকে বিজেপি : হিন্দুত্ববাদী উগ্র দক্ষিণপন্থার যাত্রাপথ

সমরেশ মিত্র

কেন্দ্রে শেষ পর্যন্ত পদ্মফুল ফুটলো। ভারতের রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতির গুণগত পরিবর্তনের দাবিদার সেই স্বপ্ন-ঘোড়ার সওয়ার নরেন্দ্র দামোদর মোদি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই যেন 'প্রাইম মিনিস্টার ইলেক্ট' হয়ে বসেছিলেন। অপেক্ষা ছিলো কবে আর কখন সেই প্রত্যাশিত ঘটনাটি বাস্তবে ঘটবে।

বামপন্থার নষ্ট চরিত্র এবং পর পর দুটি ইউপিএ সরকারের দুর্নীতি আর দুঃশাসন, দুর্জন পোষণ আর দরিদ্র জনগণকে ক্রমশ প্রান্তভূমির দিকে চলে যেতে বাধ্য করার বিরুদ্ধে যে জনাদেশ যাবে, তা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ছিলো।

যখন এই পরিপূর্ণ মাৎস্যন্যায়-এর অবসান ঘটানোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার কথা ছিলো বামপন্থীদের, তখন তারা সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালতে ব্যর্থ হয়। সমাজবিজ্ঞানের আপন নিয়মে সমাজ-গণতন্ত্রী অনুশীলনের ব্যর্থতা ভারতের রাজনীতিতে ইউপিএ-র চেয়ে আরও দক্ষিণপন্থী শক্তির আবাহন ঘটাল। ভারতের রাজনীতি-অর্থনীতির ভবিষ্যত আপাতত নিশ্চিতভাবেই রাজনৈতিক দিক থেকে দক্ষিণপন্থী শক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে রইলো।

নির্বাচনের আগে বিজেপি-র দাবি ছিলো যে ভারতের সংসদে বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে একমাত্র বিজেপি-ই কখনও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে দেশের কাণ্ডারী হয়ে বসার সুযোগ পায়নি।

অনেক বছর পর ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় সরকারে কোনও একটি দল এমন একটি সুস্পষ্ট বহুমত নিয়ে ক্ষমতায় এলো। নির্বাচনের আগে ঘোষিত প্রতিশ্রুতি বা বিজেপি দলটির পূর্ব অনুশীলন নিয়ে তাই বিচারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

জনসংঘ থেকে বিজেপি

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু-পুনরুত্থানবাদের ভূমিকার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই ধারার মধ্যে দুটি মোটা দাগের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। একটি ধারা ভারতের ওপর চেপে বসা ইংরাজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু জনমানসকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চালায়। অন্য ধারাটি পুনরুত্থানবাদের মূল ভিত্তি, 'বিশ্ব-হিন্দু সংহতি'-র অন্তর্লীন ধর্মীয় এজেন্ডাকে আরও বেগবান করতে ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সহযোগিতায় লিপ্ত হয়। হিন্দুত্ববাদ থেকে শুরু করে প্রথম ধারাটি ক্রমে ক্রমে তার ধর্মীয় পরিসর সংকুচিত করে কখনও সশস্ত্র বিপ্লবী ধারায় পর্যবসিত হয়, কখনও বা অহিংস ধারার অনুগামী হয়ে পড়ে, আর দ্বিতীয় ধারাটি ধর্মীয় পরিসর প্রসারিত করে সাম্প্রদায়িক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই মোটা দাগের রূপরেখার ভিত্তিতে বলা যায় যে আজকের বিজেপি-র প্রাণভোমরা যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, যার সদস্য না হলে, নিচুতলার শাখা থেকে ক্রমশ প্রচারক হয়ে উঠতে না পারলে, ভারতে বিজেপির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায় না, সেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ হিন্দুত্ব-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক চর্চার সবচেয়ে আগ্রাসী রূপটি আত্মস্থ করেছে।

ভারতে তথাকথিত নিম্নবর্গের আন্দোলন যত বেশি করে সংহত হতে শুরু করে, ততই ভারতের সম্পত্তিবান শ্রেণী তাদের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি রক্ষার তাগিদে ইংরাজ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতার রাস্তায় হাঁটতে থাকে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ইংরাজ শাসনের সঙ্গে সমঝোতা ও সহযোগিতার পথটি এই সম্পত্তিবান শ্রেণীকে স্বয়ং সেবকদের এই কাজের পেছনে মতবাদিক মদত যোগায়।

১৯২৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ গঠিত হওয়ার পর তাদের আদর্শ ছিলো জার্মানির হিটলারের নিখিল জার্মান ঐক্যের ডাক এবং মুসোলিনির রোমান অ্যারিস্টোক্রাসিকে ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম। স্বয়ংসেবক সংঘের মতাদর্শ নির্মাণের দুই কারিগর গোলওয়ালকর এবং সাভারকর প্রকাশ্যেই হিন্দু জাতীয়তা বলতে অতীতের হিন্দু গৌরব এবং আগ্রাসী পদ্ধতিতে অন্যান্য ধর্মের উত্থান প্রতিরোধকে বুঝিয়েছেন।

স্বয়ংসেবক সংঘ : অতীতের পাতা থেকে :

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে সেই আন্দোলনে কোনও স্বয়ংসেবক নেতাকে যোগ দিতে দেখা যায়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে কোনও স্বয়ংসেবক নেতা কখনও জেলে যাননি। তাঁদের ভূমিকা ছিলো ইংরাজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে মুসলমান বা অনান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা কমিয়ে আনার। চন্দ্রশেখর আজাদ বা বিসমিল বা ভগৎ সিং-রা যখন ইংরেজ শাসক বিরোধী তীব্র আন্দোলন করছেন, তখন কাশীতে স্বয়ংসেবক সংঘ গোমাতা বাঁচানোর আন্দোলন সংঘটিত করেছে। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের পরবর্তীকালে অত্যাচারী মুসলমান প্রশাসক নিহত হলে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করার কাজে মুসলমান সাম্প্রদায়িক শক্তি জামাত-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করেন স্বয়ং সেবকবৃন্দ। লেখক সোমেন চন্দ্র নিহত হওয়ার পেছনে এদের হাত ছিলো।

সংঘের অনুগামী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তাঁর ভাই-এর সঙ্গে ২৭ আগস্ট ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময়ে লক্ষ্ণৌ-র গ্রামে, বাটেশ্বর বাজারে একদল আইন অমান্য আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু যখন সত্যাগ্রহীরা বন আইন ভাঙার সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হয়, তখন

তাঁরা দুজন নিজেদের সেই জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। যখন ব্যাপক গ্রেপ্তার হয়, তখন এঁরা দুজনও পুলিশের জালে ধরা পড়েন। বাজপেয়ী তখন পুলিশের কাছে একটি বিবৃতি দেন, যেখানে তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন এবং আন্দোলনের দুজন সংগঠকের নাম পুলিশের কাছে প্রদত্ত বিবৃতিতে প্রকাশ করে দেন। (এই বিষয়ে যাবতীয় তথ্য প্রকাশিত হয়েছে *ফ্রন্টলাইন* পত্রিকার ফ্রেব্রুয়ারি ৭-২০, ১৯৯৮ সংখ্যায়)। দেশপ্রেমিক সাভারকার বিজেপি-র সরাসরি অংশ নন— তাই ব্রিটিশ সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়ে বেরিয়ে আসার কাহিনী বলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করছি না।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, নাথুরাম গড়সে ও গান্ধীহত্যা

১৯৪৭ পরবর্তী ভারতে প্রথম ব্যক্তিহত্যা এবং সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের হাত ধরে। এই সংঘটি ব্যক্তিগত হিংসায় বিশ্বাসী। এই সংঘের সদস্যবৃন্দ ১৯৩০ সাল থেকেই ব্যক্তিহত্যার (না, ইংরাজ রাজপুরুষ বা অত্যাচারী শাসক নয়, বরং নানান ধরনের দেশপ্রেমিক শক্তির প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু) রাজনীতি করে আসছে। তার সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর উদাহরণ হলো, সংঘ গান্ধীকে হত্যার জন্য কুড়ি বছরে মোট ছবার চেষ্টা করে। সংঘের অনুগামী নাথুরাম গড়সে তিনবার গান্ধীকে আক্রমণ করে। প্রথম দুবার খোলা ছুরি নিয়ে এবং শেষবার রিভলবার থেকে গুলি করে প্রকাশ্যে হত্যালীলা চালায়।

নাথুরাম গড়সে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। *ফ্রন্টলাইন* পত্রিকায় জানুয়ারি ২৮, ১৯৯৪-এ তাঁর ভাই গোপাল গড়সে একটি সাক্ষাৎকার দেন। মনে রাখা দরকার যে গান্ধী হত্যা মামলায় নাথুরাম-এর ফাঁসি হয় এবং গোপাল-এর ১৫ বছর কারাদন্ড হয়। লালকৃষ্ণ আদবানির দাবি, অর্থাৎ নাথুরাম সংঘের কর্মী ছিলেন না, সেই দাবি নস্যাৎ করে গোপাল বলেন যে তাঁরা চার ভাই-ই (নাথুরাম, দত্তাত্রেয়, গোপাল এবং গোবিন্দ) সংঘের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। নাথুরাম সংঘের প্রচারক পদে ছিলেন (সংঘের সাংগঠনিক কাঠামোতে এটি একটি খুবই উচ্চকোটির পদ)। ফাঁসিতে ওঠার পূর্বমুহূর্তে নাথুরাম যে প্রার্থনা সঙ্গীতটি গেয়েছিলেন সেটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শাখার উদ্বোধনী সঙ্গীত।

জনসংঘ-র প্রতিষ্ঠা

গত শতকের প্রথম দু-তিন দশক জুড়ে ভারত এবং অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু মহাসভার খুব প্রভাব ছিলো। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন হিন্দু মহাসভার প্রাণপুরুষ। ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তাল জনআন্দোলনে বিচলিত হয়ে ইংরাজ রাজপুরুষরা বিদ্রোহের তীব্রতা প্রশমিত করার অভিপ্রায় রাজ্যে রাজ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেয় এবং কংগ্রেস সহ সংসদীয় ব্যবস্থায় এবং ইংরাজের সুবুদ্ধিতে আস্থাশীল অন্যান্য দলগুলি সেই মন্ত্রীসভা গঠন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। অবিভক্ত বাংলায় ফজলুল হক-এর নেতৃত্ব প্রগতিশীল জোট-এর পক্ষ থেকে যে নির্বাচিত সরকার বাংলায় স্বায়ত্বশাসন (ইংরাজের অধীনে) চালাচ্ছিলো, সেই মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কর্মী নাথুরাম গড্সের হাতে গান্ধী-নিধন সম্পন্ন হওয়ার পর হিন্দুত্ববাদীরা একটু বিপদে পড়ে। চিৎপবন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অ-ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য হিন্দু সমাজের বিরোধ চরমে ওঠে। এই বিরোধ নিরসনের জন্য শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভার কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেন যে হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য অটুট রাখার জন্য হিন্দু মহাসভা যেন তার সমর্থনের ভিত অন্যান্য অ-ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রসারিত করে। কিন্তু হিন্দু মহাসভা তাঁর এই যুক্তি মানতে অস্বীকার করায় শ্যামাপ্রসাদ তাঁর স্বপ্ন মতো হিন্দুত্ববাদী একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন।

ভারত এবং বাংলা বিভাগের পরবর্তী সময়ে দুই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ নেয়। এই দাঙ্গা প্রশমনের জন্য দিল্লিতে এসে পৌঁছোন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী লিয়াকৎ আলি খান। নেহরু এবং লিয়াকতের মধ্যে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী স্তরে দীর্ঘ আলোচনা চলে এবং নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি হয়। শ্যামাপ্রসাদ তখন নেহরু মন্ত্রীসভার সদস্য। শ্যামাপ্রসাদ পাকিস্তানের সঙ্গে যেকোনো রকমের আলোচনার বিরোধী ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ এই চুক্তির বিরোধিতা করে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

একদিকে যেমন স্বয়ংসেবক সংঘ উগ্র হিন্দুত্ব প্রচার করতো, অন্য দিকে ভারতের আর্য সমাজ একটু নরম হিন্দুত্ব নিয়ে হাজির হয়। শ্যামাপ্রসাদ আর্য সমাজের বলরাজ মাধক এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের গোলওয়ালকর-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে, এই দুই হিন্দুত্ববাদী শক্তিতে একজোট করে একটি নতুন রাজনৈতিক দল, ভারতীয় জনসংঘ, প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লিতে এই পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে ২১ অক্টোবর, ১৯৫১। ততদিনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ওপর থেকে রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা (গান্ধী হত্যার পর জারি হওয়া) প্রত্যাহৃত হয়েছে। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে এই দলটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনটি আসন লাভ করে এবং মোট ভোট-এর তিন শতাংশ পাওয়ায় তা জাতীয় দলের স্বীকৃতি পায়।

দল ভাঙানোর রাজনীতি আর রাজনৈতিক কোন্দলের মধ্যে দিয়ে যে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করে এই জনসংঘ দলটি, প্রয়োজন অনুসারে দলটি বারবার তার নাম-ধাম-পোষাক পরিবর্তিত করেছে, যদিও দলটির শিরদাঁড়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ অপরিবর্তিত থেকে যায়।

জনসংঘ থেকে জনতা পার্টি

১৯৭৩ সালের জুন মাসে রায়বেরিলি থেকে জিতে আসা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন খারিজ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয় এবং প্রায় সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, এমনকি বেশ কিছু মন্ত্রীসভার

সদস্যকেও ইন্দিরা গান্ধী গ্রেপ্তার করেন। এই বিরোধী দলনেতা হিসেবে জনসংঘ এবং জনসংঘের আত্মস্বরূপ স্বয়ংসেবক সংঘের অনেক নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হন। জরুরি অবস্থার অবসানের পর নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রশ্নে ইন্দিরা-বিরোধী একটিমাত্র অকংগ্রেসী পার্টি নির্মাণের প্রশ্ন সামনে আসে। বিরোধী নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের মধ্যস্থতায় নানান বিরোধী দল, যেমন আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, ভারতীয় লোকদল, স্বতন্ত্র পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি সহ ১২ দল ও গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে জনতা পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। এই নতুন পার্টির সভাপতি হন কর্নাটকের হেগড়ে এবং জনসংঘের লালকৃষ্ণ আদবানি। ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী পর্যুদস্ত হন, শাসনক্ষমতায় আসে জনতা দল।

জনতা পার্টি থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি

জয়প্রকাশ নারায়ণ যখন ১২টি পার্টিকে সংহত করে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলগঠনের প্রক্রিয়ার জন্ম দেন, তখন নিজেদের মধ্যে এই বোঝাপড়া ছিলো যে প্রতিটি দল তার পৃথক সত্তা বিসর্জন দিয়ে জনতা পার্টির কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

কিন্তু প্রথম থেকেই ভারতীয় জনসংঘের প্রতিনিধিবৃন্দ জনতা পার্টিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কর্মসূচি রূপায়ণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়। সোসালিস্ট পার্টির নেতা ঘোষণা করেন যে, জনসংঘের প্রতিনিধিরা হয় জনতা পার্টির হয়ে কাজ করুন এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ছেড়ে দিন, নয় তাঁরা জনতা পার্টি ভুলে গিয়ে স্বয়ংসেবক সংঘের হয়ে প্রকাশ্যে কাজ করুন।

এই দ্বৈত সদস্যপদের প্রশ্নে জনসংঘের প্রতিনিধিবৃন্দ জনতা পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৮০ সালে ডিসেম্বরে অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বে জনসংঘের অংশটি জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠন করে। প্রথম থেকেই ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বয়ংসেবক সংঘের দ্বৈত সদস্যপদ রাখা নিয়ে সহমত ছিলো।

বিজেপির ক্ষমতা দখল

বিজেপির জোটই ভারতের রাজনীতিতে এখন পর্যন্ত একমাত্র অকংগ্রেসি জোট, যারা ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত একটানা ৬ বছর কেন্দ্রে ক্ষমতা ধরে রেখেছে। এর আগে যেসব অকংগ্রেসি জোট কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে তারা কেউই দ্বিতীয়বার ফেরেনি, বা এতদিন ক্ষমতায় থাকেনি। ১৯৮৪-র সাধারণ নির্বাচনে মাত্র ২টি আসন পেলেও ১৯৯১-এর নির্বাচনে বিজেপি ১২০টি আসন লাভ করে। ভোটের শতাংশে ২০ শতাংশ ভোট বিজেপির দখলে থাকে। মনে রাখতে হবে যে এই নির্বাচনের প্রাক্কালে সারা দেশ দাঙ্গায় দীর্ণ হয়, 'বিদেশি হঠাও' আন্দোলন সহ নানা জাতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিজেপির আশ্রয়ে চলে আসে। ১৯৯২ সালে রামজন্মভূমির জিগির তুলে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয় বিজেপি এবং তার সহযোগী বজরং দলের নেতৃত্বে। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে বিজেপি ১৮০টি আসন দখল করে সর্ববৃহৎ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সর্ববৃহৎ দল হিসেবে বিজেপি একটি সংখ্যালঘু মন্ত্রীসভা গঠন করে, যা মাত্র ১৩দিন স্থায়ী হয়েছিলো।

১৩ দিনের শাসনের খতিয়ান

বিজেপির অন্যতম মতবাদিক গুরু সাভারকর ১৯৫৬ সালেই বলেছিলেন ভারতীয় হিন্দুদের উচিত ইজরায়েলের কাছ থেকে এই শিক্ষাগ্রহণ করা যে কীভাবে চারদিক থেকে মুসলমান রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, কেবল দ্রুত সামরিকীকরণ করে নিজের ভূখণ্ড রক্ষা করতে হয় এবং সম্ভব হলে রাষ্ট্রের সীমানা প্রসারিত করতে হয়। সাভারকার-এর নির্দেশ মেনে তখন থেকেই স্বয়ংসেবক সংঘ ইজরায়েলের বন্ধু হয়ে ওঠে।

যখন সংসদে শক্তি পরীক্ষার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়নি, তখনই প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নির্দেশে এতদিন পর্যন্ত ইজরায়েল নিয়ে ভারতের ঘোষিত নীতি পরিবর্তিত করে ভারত সরকার ইজরায়েল-বান্ধব নীতি ও অবস্থান গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু মন্ত্রীসভা পতনের জন্য এই সমস্ত পদক্ষেপ কার্যকর করা যায়নি।

ঐ ১৩ দিনের মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী হিসেবে শ্রী যশোবন্ত সিন্‌হা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক যখন লোকসভায় প্রমাণিত হয়েছে যে বিজেপি সরকার সংখ্যালঘু সরকার, তাকে পদত্যাগ করতে হবে, তখন সেই সাজানো মন্ত্রীসভাকেও এড়িয়ে গিয়ে সিন্‌হা কুখ্যাত এনরন সংস্থাকে 'কাউন্টার-গ্যারান্টি' দিয়ে বাঁচিয়ে তোলে এবং ভারতের করদাতাদের রক্ত জল করা টাকা ভরতুকি হিসেবে এনরনকে পাইয়ে দেয়। এখানে এটা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে নির্বাচনের আগে জনবিরোধী এনরন চুক্তি বাতিল করা ছিল বিজেপি-র একটি দাবি এবং স্বয়ং সেবক সংঘের ছোট ভাই, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ এনরনের বিরুদ্ধে কিছু সত্যাগ্রহ সংগঠিত করে।

তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ তাঁর কাছের মানুষ 'জৈন-হাওলা খ্যাত' জৈন টিভি-র মালিককে বেআইনিভাবে দুরদর্শনের সম্প্রচারের উপগ্রহ ব্যবহারের সুযোগ করে দেন। তাঁর স্নেহধন্য আরও কিছু বেসরকারি চ্যানেলকেও তিনি উপগ্রহের 'স্লট' পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী মুরলী মনোহর যোশী প্রথম দিন থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হুমকি দিতে শুরু করেন এবং বিভিন্ন কুকার্যে লিপ্ত থাকার অভিযোগে জেলে থাকা স্বয়ংসেবক কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া চালু করেন। তখন কাশ্মীরে নির্বাচন চলছিলো। তিনি সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রেরণ করে নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রভাবিত করার চেষ্টা চালান। আসাম-এর কোকড়াঝাড় জেলাতে মুসলমান এবং আদিবাসী জনতাকে 'শায়েস্তা' ('to teach them a lesson') করতে আধাসামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন।

রাম জেঠমালানি আইনমন্ত্রী হয়ে একটিই ঘোষণা করেছিলেন— জৈন হাওলা কাণ্ডে আদবানি নির্দোষ।

বিজেপি-র দ্বিতীয় দফা— ১৩ মাস

দ্বিতীয় দফায়, ১৯৯৮ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসে প্রায় ২১টি দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে। কে ছিলো না সেই জোটে! সুদূর তামিল ভূমির জয়ললিতা থেকে বাংলার 'অগ্নিকন্যা' মমতা সেই জোটে সামিল। কিন্তু তামিল আম্মা এবং তাঁর সহকর্মীদের আয়কর বিভাগ কর না দেওয়ার অভিযোগে আদালতে ডাকলে আম্মা সমর্থন প্রত্যাহার করেন এবং ১৩ মাসের মাথায় সরকারের পতন হয়।

এই সরকার প্রথম থেকেই ইজরায়েলের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা চালায়। রাষ্ট্রসংঘে ইজরায়েল-বিরোধী প্রস্তাবগুলি পেছিয়ে দেওয়ার জন্য ভারত তৎপরতা চালায় এবং ইজরায়েল থেকে সামরিক দ্রব্যাদি কেনার প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়।

বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হয়েই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ-এর নয়া ক্ষেপণাস্ত্র সুরক্ষা প্রকল্পের অংশীদার হন। এই অংশীদার হওয়ার কারণে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন দাদাগিরির প্রত্যক্ষ সহায়ক হয়েছে ভারত সরকার।

জোট নিরপেক্ষতার নীতি বিসর্জন দিয়ে বাজপেয়ী সরকার মার্কিন দেশের চীন-বিরোধী জোটে যোগ দেয় এবং মার্কিন দেশের 'বিপন্ন গণতন্ত্রকে' পুনরুদ্ধারের জন্য মার্কিন কর্মকাণ্ডের অংশীদারও হয়ে ওঠে বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার।

এই সমস্ত কিছুর হাত ধরে ভারত সরকার মার্কিন দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সামরিক সম্পর্ক তৈরির উদ্দেশ্যে গাটছড়া বাঁধে। ভারতের সামরিক অফিসাররা মার্কিন দেশে গিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে আসে এবং মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শদাতাদের উপদেশ মতো ভারতের সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা দপ্তর ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়। ভারত সরকার বহুদিন থেকেই ভারত মহাসাগরে দিয়েগো গার্সিয়া থেকে মার্কিন নৌঘাঁটি অপসারণের দাবি তুলেছিল। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের দাবিও ছিলো তাই। কিন্তু ১৩ মাসের বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানায় যে ভারত মহাসাগরে মার্কিন নৌঘাঁটিতে ভারতের আপত্তি নেই। বরং তারা বলে যে এই বিষয়ে ভারতের নৌবাহিনী মার্কিন দেশকে সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

ভারতের যুব-ছাত্ররা এককালে প্রবল গণ-আন্দোলন সংঘটিত করে ভারতের মাটি থেকে মার্কিন অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা, ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বা এফবিআই-কে ভারত পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে। ভারতে ঘাঁটি গেড়ে এই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাটি এদেশে ভিয়েতনামের সমর্থনে মার্কিন-বিরোধী আন্দোলনে অন্তর্ঘাত চালানোর কাজ করতো। ১৯৯৯-এর এপ্রিলে বাজপেয়ী সরকার নয়াদিল্লির মার্কিন দূতাবাসের অভ্যন্তরে এফবিআই-এর দপ্তর খোলার অনুমতি দিয়ে দিলেন। এফবিআই-এর দপ্তর চালু হওয়ার পর ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রক, ভারতের গোয়েন্দা সংবাদের একটি বড় অংশ নিয়মিত ভাবে এফবিআই-কে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক গোয়েন্দা-বিষয়ক তথ্য বিনিময়ের প্রক্রিয়া চালু করে।

অমেরিকার সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি বা সিআইএ হলো মার্কিন দেশের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত গুপ্তচর সংস্থা। এতদিন পর্যন্ত এই ঘৃণিত সংস্থাটি ভারতের মাটিতে চোরা-গোপ্তা পথে গুপ্তচরবৃত্তি করতো। এই সংস্থাটিকে প্রকাশ্যে কাজ করার সুবিধে দেওয়ার তাগিদে বাজপেয়ীর প্রতিরক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা শ্রী ব্রজেশ মিশ্র সিআইএ-র ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে মার্কিন দেশ ছোটেন। বিষয়টি গোপনীয় হলেও মার্কিন দেশের বিভিন্ন পত্রিকার খবর অনুসারে ভারতের গোয়েন্দা দপ্তর এবং সিআইএ পরস্পরের সহযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া, বাজপেয়ী সরকারের আমলে পোখরান-দুই পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ এবং উপমহাদেশে যুদ্ধজিগির তৈরি করা হয়। পরবর্তী সময়ে তারা পাকিস্তানের সঙ্গে কার্গিল যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়।

বিজেপির তৃতীয় দফা (১৯৯৯-২০০৪)

বিজেপির তৃতীয় দফায় নয়া উদারনীতিবাদ দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। বেসরকারিকরণ এবং বিলগ্নিকরণের নতুন মন্ত্রক এবং দপ্তর খোলা হয়। সারা দেশ জুড়ে দাঙ্গা, অত্যাচার, কালাকানুন এবং সংখ্যালঘু-আদিবাসীদের ওপর নিপীড়নের বল্গাহীন ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়া হয়।

নয়া উদারনীতিবাদের হাত ধরে আসে দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ আর আর্থিক কেলেঙ্কারি। পাঁচ বছর জোট সরকার চালিয়ে বিজেপি যেমন বেপরোয়াভাবে দুর্নীতি আর কেলেঙ্কারির জন্ম দিয়েছে, ২০১৪-র একক গরিষ্ঠতায় তা লাগামহীন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বাজপেয়ী সরকারের তৃতীয় দফাকে একই সঙ্গে রিপাবলিক অফ হাঙ্গার এবং রিপাবলিক অফ স্ক্যাম বলা যায়। এখানে আমরা হিমশৈল-র চূড়া, কয়েকটি মাত্র কেলেঙ্কারির কথাই বলবো।

কার্গিল কফিন কেলেঙ্কারি : কার্গিল যুদ্ধে মৃত ৫২৭ জন ভারতীয় সৈনিকের মৃতদেহ তাদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক মার্কিন সংস্থা বুইট্রন এ্যান্ড বেইডা-র কাছ থেকে ৫০০টি কফিন কেনে, কফিন পিছু দাম আন্তর্জাতিক বাজার মতে ২৫০ মার্কিন ডলার। কিন্তু প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং অন্যান্য বিজেপি নেতার সুপারিশে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কফিন পিছু দাম দেয় ২৫০০ মার্কিন ডলার (অর্থাৎ প্রতিটি কফিনের দাম পড়ে লক্ষাধিক টাকা, আজ থেকে ১৫ বছর আগে)। ভারতের কম্পট্রোলার জেনারেল এই বিষয়ে বিরাট আর্থিক কেলেঙ্কারির কথা ঘোষণা করে কড়া নোট দেয় এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্দেজ এই কেলেঙ্কারির সঙ্গেযুক্ত বলে অভিযোগ ওঠে।

ওয়েস্ট এন্ড কেলেঙ্কারি (২০০১) : বিজেপির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বঙ্গারু লক্ষণ এবং জয়া জেটলি (সমতা পার্টি) সহ আরও বেশ কিছু নেতার বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তাঁদের ঘুষ নেওয়ার দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী হয়। এই নিয়ে মামলা

শুরু হলে যে সাংবাদিকরা এই কেলেঙ্কারি ফাঁস করে দেন তাঁদের হেনস্তা করা শুরু হয়। বিজেপি সরকার এই মামলাটি চেপে দেয়।

পেট্রল পাম্প ও গ্যাস এজেন্সি বিলি করা সংক্রান্ত কেলেঙ্কারি (২০০২) : কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী শ্রী রাম নায়েক-এর ওপর মন্ত্রীসভা দায়িত্ব দেয় কার্গিল যুদ্ধের শহিদদের পরিবারগুলিকে পেট্রল পাম্প ও গ্যাস এজেন্সি বিলি করার। মন্ত্রী সাহেব কার্গিল শহিদদের পরিবারবর্গকে সেই সব এজেন্সি বিতরণ না করে এই সমস্ত এজেন্সির বেশির ভাগই নিজের আত্মীয়-পরিজন এবং উত্তর ভারতের উঠ্‌তি বিজেপি নেতাদের বেনামে ও স্বনামে দিয়ে দেন। বিষয়টি জানাজানি হলে বিজেপি ব্যাপারটা চেপে দেয় এবং রাম নায়েক আরও গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়ে যান।

ইউটিআই আর্থিক কেলেঙ্কারি : ভারত সরকার আইন করে ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া গঠন করেছিল ক্ষুদ্র সঞ্চয়ীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য। বস্তুত ইউনিট ট্রাস্ট এক পর্যায়ে প্রায় ২ কোটি ক্ষুদ্র সঞ্চয়ীদের কাছ থেকে আমানত নিয়ে তাদের দফায় দফায় সুদ দিতে থাকে। ইউটিআই-এর সম্পত্তি বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৭৫০০০ কোটি টাকায়। ১৯৯৮-৯৯-এ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে ইউটিআই-এর এই টাকা বেআইনিভাবে ফাট্‌কাবাজীতে চড়িয়ে প্রায় ২৫০০০ কোটি টাকা গায়েব করে দেয়। এর ফলে প্রায় ২ কোটি ক্ষুদ্র সঞ্চয়ী পথে বসলেও লাভবান হন জোহর ভ্রাতৃদ্বয়— এঁরা স্বয়ংসেবক সংঘের একনিষ্ঠ কর্মী। এই জোহর ভ্রাতৃদ্বয় পরে আদবানির প্রত্যক্ষ সহায়তায় মুম্বই শহরের একটি নির্মাণ ব্যবসা থেকে বেআইনিভাবে বিপুল টাকা আত্মসাৎ করে।

বেসরকারিকরণ : বিজেপি সরকার ২০০০ সালে ইন্ডিয়ান ট্যুরিজিম ডেভলপমেন্ট করপোরেশন নামক সরকারি সংস্থার হাতে থাকা ১৯টি হোটেল জলের দরে একটি বেসরকারি ভ্রমণ সংস্থার হাতে তুলে দেয়। এছাড়াও তারা ৯টি সরকারি সংস্থা বিলগ্নিকরণ দপ্তরের মাধ্যমে বিক্রি করে মাত্র ৫৫৪৪ কোটি টাকায়— যেখানে সরকারি হিসেব অনুসারেই প্রতিটি সংস্থার আলাদা করেই সম্পত্তি ছিলো ২০০০ কোটি টাকা!

বাল্‌কো ছিল ভারত সরাকরের অধীনে একটি অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন সংস্থা। সরকার এই লাভজনক সংস্থাটিকে বেসরকারি সংস্থা স্টারলাইট-কে মাত্র ৫৫১ কোটি টাকায় বেচে দেয়। বিক্রির সময় সরকারি মতে বাল্‌কোর সম্পত্তির পরিমাণ ছিলো ৬০০০ কোটি টাকা।

নরেন্দ্র মোদির গুজরাটের সমবায় ব্যাংক, পঞ্চমাঞ্চল সমবায় ব্যাংক থেকে ২০০৩-এ ১২৪ কোটি টাকা গায়েব হয়ে যায়। এর কারণ ছিলো মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নির্দেশে ভুল বিনিয়োগ এবং জামিন না রেখে ঋণ দান। ব্যাংকের আধিকারিকরা গুজরাটের বিজেপির রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী প্রভাত সিং চৌহান এবং আরও ২৮ জন বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপ-এর অভিযোগ দায়ের করেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সক্রিয় কর্মী, শিল্পপতি এ এল বাত্রা দেশের সমস্ত আইন ভেঙ্গে মুম্বই অন্তর্দেশীয় বিমানবন্দরের পাশে, সরকারি সংস্থা হোটেল করপোরেশন অফ ইন্ডিয়ার অধীনস্থ সেন্টাউর হোটেল নিলামে খরিদ করেন মাত্র ৮৩ কোটি টাকায়। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। নিলামে সর্বোচ্চ দামে নয়, সর্বনিম্ন দামে তিনি এই হোটেলটি কেনেন। নিলামে উপস্থিত সরকারি আধিকারিকরা এই নিলাম প্রক্রিয়ায় গুরুতর গলদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও সরকার তা আমল দেয়নি। হোটেলটির দলিল হাতে পেয়েই মাত্র ২৯ দিনের মাথায় বাত্রা সাহেব হোটেলটি সাহারা গোষ্ঠীকে ১১৫ কোটি টাকায় বেচে দেয়। এই বিষয়টি নিয়ে হইচই বাধে। ২০০৪-এ ভারতের কম্পট্রোলার জেনারেল তাঁর রিপোর্ট-এ বলেন যে এই হস্তান্তর বেআইনি, বাত্রাকে অন্যায্য সুবিধে দেওয়া হয়েছে, নিলাম প্রক্রিয়া দুর্নীতিতে ভরপুর এবং এই লেনদেনে ভারত সরকারের অন্তত ১৪৬ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে।

গুজরাট মডেল

গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। দাঙ্গা নিয়ে এই প্রবন্ধে আমরা কিছু বলছি না।

মোদি বলেছেন 'গুজরাট মডেল'-এর সাফল্য তিনি সারা দেশে ছড়িয়ে দেবেন। 'গুজরাট মডেল' কাদের কতটা লাভবান করবে তার একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা ইতি টানবো। (এ বিষয়ে একটি লেখা রয়েছে *অনীক*-এর বর্তমান সংখ্যাতেই)

গুজরাটের শিল্পপতি গৌতম আদানির মেয়ের বিয়েতে একজন মন্ত্রীই দুদিন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন— তাঁর নাম নরেন্দ্র মোদি। নরেন্দ্র মোদি-র শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে একজন গুজরাটি শিল্পপতিই ব্যবস্থাপনার কাজে দুদিন ব্যয় করেছেন— তাঁর নাম গৌতম আদানি।

মোদির এক দশক রাজত্বে গৌতম আদানির উত্থান রোমাঞ্চকর করপোরেট মাফিয়া কাহিনী *গডফাদার*-কেও হার মানায়। ২০১২ সালে গুজরাট সরকার গৌতম আদানির সংস্থাকে ৫.৭৮ কোটি বর্গমিটার জমি লিজ হিসেবে দেয়। সমুদ্রের উপকূলবর্তী জমির জন্য ভাড়া বর্গমিটার পিছু ৩২ টাকা আর উপকূল থেকে দূরবর্তী জমির ভাড়া বর্গমিটার পিছু ১ টাকা মাত্র। এই জমির ওপর নির্মিত হয়েছে মুন্দ্রা বিশেষ আর্থিক অঞ্চল এবং মুন্দ্রা পোর্ট অ্যান্ড সেজ লিমিটেড।

এর আগে ২০০৫ সালে মোদির সরকার আদানি গোষ্ঠীকে ৭৩৫০ হেক্টর জমি বিক্রি করে জলের দরে— বর্গমিটার প্রতি ৪.৫ টাকা। সেই বছরেই আদানি গোষ্ঠী ভারতের সরকারি সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েলকে ঐ জমির একাংশ লীজ দেয়— দাম হাঁকে বর্গমিটার পিছু ৬৬০ টাকা! ইন্ডিয়ান অয়েল প্রথমে জমি নিতে

এর পর ৩০ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

মোদির ভারতবর্ষ

রতন খাসনবিশ

আইআইটি-আইআইএম শিক্ষিত ঝকঝকে চেহারার এক তরুণের সঙ্গে কথা হচ্ছিল লোকসভা নির্বাচনের কিছুদিন আগে। মোদি সমর্থক এই তরুণটির কাছে গুজরাট দাঙ্গার প্রসঙ্গ তুলতে এমন একটি তত্ত্ব জানা গেল, বছর দেড়েক আগে পুনে শহরে এক চিৎপাবন ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের কাছে যা প্রথম শুনেছিলাম। তত্ত্বটি এইরকম যে, ভালো কথা বলে মুসলমানদের 'সবক' শেখানো যায় না। ভালো কথাকে 'ওরা' দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করে। গুজরাটে ফি বছর দাঙ্গা লেগে থাকত নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার আগে। দাঙ্গা থামাতে সবাই মিলে মুসলমান ধর্মনেতাদের তোয়াজ করত। তোয়াজের ফলে সাময়িকভাবে শান্তি ফিরত, কিন্তু তার পরই মসজিদগুলো থেকে আবার রণহুঙ্কার তোলা হতো। ফলে কিছুদিন পরেই আবার দাঙ্গা বাধত। এই চেনা ছকটা ভেঙে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। গুজরাটের মুসলমানরা এখন জানে, ধর্মগুরু ও সন্ত্রাসবাদীদের প্ররোচনায় তারা যদি এখন দাঙ্গা বাধায়, তবে গোটা মুসলমান সমাজকেই তার দাম দিতে হবে। সেটা বুঝেই তারা এখন ধর্মগুরু এবং সন্ত্রাসীদের পাত্তা দেয় না। তেমন কিছু ঘটতে দেখলে নিজেরাই তা থামিয়ে দেয়। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পুলিশে ধরিয়ে দেয়। ধর্মের নামে কোনো রাজনীতি তারা আর করে না। এটা হলো 'সবক' শেখা, মোদি যেটা তাদের শিখিয়ে ছেড়েছে। তাই আইআইটি-আইআইএম শিক্ষিত তরুণটি এর সাথে আরো যুক্ত করল যে, সারা পৃথিবী জুড়ে মুসলিম রাজনীতিকে এভাবেই মোকাবিলা করে ফল পাওয়া যাচ্ছে; বিন লাদেনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এই উপায়েই। পাকিস্তানেও তালিবানপন্থীরা কোণঠাসা হয়ে পড়ছে এই কড়া ওষুধ প্রয়োগ করার পরই। ভারতেও এটাই হবে। মোদি ক্ষমতায় এলে মুসলমানরা 'সবক' শিখবে। পাকিস্তান এইসব সন্ত্রাসীদের মদত দিতে দুবার ভাববে, আরবের টাকায় মসজিদ গড়ে হুংকার তোলার প্রবণতাও কমবে এদেশে।

উত্তর-আধুনিকতার ভাষায়, এই 'টেক্সট্‌টির' বিনির্মাণ বা ডিকনস্ট্রাকশন করলে অন্য যে টেক্সট্‌টি পাওয়া যায়, মোদির ভারত জয়ের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে সেই টেক্সটির ভাষাতেই গড়ে উঠছে অন্য এক 'ডিসকোর্স', বহুত্ববাদী ভারতবর্ষে এতদিন যা মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস পায় নি। অচিরেই এটি যে হয়ে পড়বে 'ডমিনেন্ট ডিসকোর্স', এই আশঙ্কা করার কারণও আছে।

বহুত্ববাদী ভারতবর্ষ জানত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই ভারতবর্ষে নিজ নিজ আচার-আচরণ-ধর্মবিশ্বাস-সামাজিক রীতিনীতি রক্ষা করে বসবাস করতে পারবে, ভারত রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। দেশভাগের সময় 'পাকিস্তান'-এর বিপরীতে এখানে 'হিন্দুস্থান' গড়া হয়নি, সংবিধানের শুরুর শব্দগুলিতে "India that is Bharat" না লিখে "India that is Hindustan" বলা হয় নি। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও ভারত রাষ্ট্র এদেশ থেকে মুসলমান বিতাড়নের কোনো কথাই বলেনি। বরং এদেশে মুসলমানরাও যাতে নিরাপদে বসবাস করতে পারে তার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। মুসলমানরাও এই রাষ্ট্রের ওপর আস্থা রেখেছে। সংখ্যালঘু মানুষদের আস্থা অর্জন করতে পারার কষ্টিপাথরে যাচাই করলে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের তুলনাতেও ভারতরাষ্ট্র যে অনেক বেশি সফল তার প্রমাণ এই যে স্বাধীনতার পর থেকে হিসাব করলে দেখা যাবে যে এদেশের জনসংখ্যায় সংখ্যালঘুর শতাংশ আদৌ কমেনি, বরং প্রান্তিকভাবে হলেও তা বেড়েছে। পাকিস্তান, এমনকি বাংলাদেশেও এটা ঘটেনি। পাকিস্তান শুরু করেছে দেশটিকে প্রায় হিন্দুশূন্য করেই। বাংলাদেশ থেকেও সংখ্যালঘুরা ধীরে ধীরে ভারতে চলে এসেছে বেশ লক্ষণীয় মাত্রায়।

এর অর্থ এই নয় যে, এদেশটিকে 'হিন্দুস্থান' করার কোনো প্রবণতা ছিল না। অবশ্যই তা ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রর সঙ্গে ধর্মকে মেলানোর কোনো উদ্যোগই তেমনভাবে সফল হয় নি এদেশে। পাকিস্তান, এমনকি বাংলাদেশেও যখন ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়ে গেল, ভারতবর্ষে কেউ প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে এটা বলতে পারেনি যে এদেশের রাষ্ট্রধর্ম হবে হিন্দুধর্ম। জাতপাত এবং ধর্মীয় বৈষম্য দূর করার ক্ষমতা ছিল না নেহরু বা ইন্দিরা গান্ধীর। জাতভিত্তিক এবং ধর্মভিত্তিক বৈষম্য এদেশে এখনো পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে এদেশে নিম্নজাতির একটা অংশ স্বচ্ছন্দে ওপরে উঠে আসতে পেরেছেন, অস্পৃশ্যতা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়নি এদেশে। মুসলমানদের মধ্য থেকেও অনেকেই জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এঁরা কি আদৌ বঞ্চিত হননি? অবশ্যই হয়েছেন। তবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, বঞ্চিত হয়েছে নিম্নজাতি ও মুসলমানদের দুর্বল অংশটিই। সেটা ইদানিং আবার অনেকটাই দাঁড়িয়ে গেছে নিম্নবর্গের বঞ্চনায়। মুসলমান এবং নিম্নজাতির মধ্যে নিম্নবর্গের আধিক্য বেশি। শ্রেণীবিভক্ত ভারত সেটাই বহন করেছে ও তাকে আরো শক্তিশালী করেছে। এই অভিজ্ঞতা নিয়েই আমরা বেঁচে থাকি। কিন্তু তবুও বলতে হবে, এই বৈষম্যকে ধর্মের মোড়কে ভরা যায়নি এদেশে।

এটা ঘটতে পেরেছে এই কারণে যে, যে ডমিনেন্ট এই 'ডিসকোর্স' এই রাষ্ট্রটিকে গঠন করেছে, শত প্ররোচনা সত্ত্বেও

তার প্রবক্তারা ভারতবর্ষের বহুত্ববাদী চারত্রটি নষ্ট হতে দেননি। এঁদের রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি জিন্নাকে ক্রমশ পাকিস্তানপন্থী করে তুলেছে সন্দেহ নেই, মুসলমানদের মধ্যে একটা অবাস্তব জাতিসত্তা আকাঙ্ক্ষার যে বীজ বপন করা হয়েছিল, কোনো সন্দেহ নেই যে তাকে সারে জলে পুষ্ট করেছে নেহেরু সহ প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের এই কংগ্রেসী নেতারাই। কিন্তু দেশভাগ যখন বাস্তব হয়ে উঠলো, তখন সেই কংগ্রেসই আবার কিছুতেই এদেশের বহুত্ববাদী চরিত্রটি নষ্ট হতে দেয়নি। যে খণ্ডিত ভারতের রাজ্যপাঠ তাদের হাতে এলো, সচেতনভাবে তাকে তাঁরা করলেন 'ইন্ডিয়া' বা 'ভারত', কখনই তাকে তাঁরা 'হিন্দুস্তান' হতে দিলেন না। এর কারণ হল, যে আধুনিকতার হাত ধরে জাতি চিন্তার বিকাশ হয়, সেই আধুনিকতার 'ডমিনেন্ট ডিসকোর্স'-টি ইতিমধ্যেই এই বহুত্ববাদকে নিজেদের চিন্তায় ধারণ করে ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথের কিংবা গান্ধীজীর ভারত চিন্তায় তার ছাপ ছিল, ফেবিয়ান সোসালিস্ট নেহেরুর মধ্যে তা ছিল পুরোমাত্রায়, বিশ্বজোড়া সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতির ছাপ পড়েছিল ব্যাপকভাবে— যে সমাজতন্ত্র ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে আলাদা করার বুর্জোয়া প্রগতিশীল চিন্তাকে নিজস্ব জীবনদর্শনের অংশ করে ফেলেছে ততদিনে। প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই ছিল। প্যাটেল-শ্যামাপ্রসাদ-রাজেন্দ্রপ্রসাদ-পন্থ অক্ষটি মোটেই কম শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু সময়টা ছিল এদের বিরুদ্ধে। গান্ধী-নেহেরু অক্ষটিই জোরদার হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে সে সময়কার ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও, কারণ আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে তখনকার আধুনিকতা হল সমাজতন্ত্রের আধুনিকতা, ধর্ম যার সঙ্গী নয় (পাকিস্তান এই আধুনিকতার স্বাদ পায়নি, কারণ শুরু থেকেই তার রাষ্ট্রচিন্তা ছিল ধর্মভিত্তিক, সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রবেশদ্বার যা রুদ্ধ করেছিল জন্মলগ্ন থেকেই)। কালক্রমে এই ডিসকোর্সটাই এদেশে দাপটের সঙ্গে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। প্যাটেল-শ্যামাপ্রসাদের ডিসকোর্সটি কোণঠাসা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়-আইআইটি-আইআইএম-এর চিন্তার জগৎটি দখল করে রেখেছিল এই ডিসকোর্সটি, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে একাকার করার যাবতীয় কু-চিন্তার বিরুদ্ধে যা বরাবর সোচ্চার থেকেছে। চিৎপাবন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক কিংবা শানিত চেহারার এই আইআইটি-আইআইএম গ্রাজুয়েট যে পুনের এক মুসলিম তথ্যপ্রযুক্তিকর্মীকে শিবাজী বিরোধিতার জন্য খুন করার দর্শনকে সমর্থন করতে পারে; সমানে তারা সদর্পে আস্ফালন করে বেড়ানোর সাহস পেত না সেই সময়।

সময়টা বদলালো সোভিয়েতের পতন এবং নয়া উদারবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে। সোভিয়েতের পতন পৃথিবী জুড়ে যে ইডিওলজির জয় ঘোষণা করলো তা শুধু জার-জারিনার পুনর্বাসন ঘটিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। রাশিয়ায় গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের সুদিন ফিরলো, ইউরোপের মানুষ আবার চার্চমুখী হলো, বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব স্কুল পাঠপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার চাপ বাড়লো (মার্কিন দেশে তো তা অনেক রাজ্যে অবশ্যপাঠ্য করা হয়েছে)। ফিরে এলো 'ধর্মভিত্তিক পরিচয়'-সত্তার রণহুঙ্কার— সাবেক যুগোশ্লাভিয়া, সাবেক আলবেনিয়া যার দাম দিচ্ছে আজও। এই খৃশ্চান পরিচয়সত্তা আবার তার 'অপর' হিসেবে 'মুসলিম' পরিচয়সত্তার জমিকে শক্ত করেছে। প্রাক্-আধুনিক যুগের মতো করে ক্রুসেড শুরু হয়েছে, আর ক্রুসেডের ব্যাপ্তি ও গভীরতা মধ্যযুগের ক্রুসেডকে হার মানাবার জায়গায় চলে এসেছে। এতে তাই অবাক হবার কিছু নেই যে, সমাজতান্ত্রিক আধুনিকতার যে ভারত ধর্মরহিত রাষ্ট্রচিন্তাকে প্রাধান্যে রাখতো, সে ভারত ক্রমশ অতীতের বিষয় হয়ে যাবে। প্যাটেল-শ্যামপ্রসাদের রাষ্ট্রচিন্তা এদেশে ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠবে। সোভিয়েতের পতনের পরবর্তী যুগে, নয়া উদারবাদী ইডিওলজির বিশ্ব বিজয়ের যুগে ঠিক সেটাই ঘটেছিল ভারতে—নিঃশব্দে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই সে তার জমি শক্ত করছিলো। নির্বোধ মুসলিম ধর্মনেতারাও এই হিন্দুরাষ্ট্র চেতনাকে সারে জলে পুষ্ট করছিল জেহাদি বা সন্ত্রাসীদের জন্য বীরপূজার ব্যবস্থা করে। এই শক্ত জমির উপরই দাঁড়াচ্ছে মোদির রাষ্ট্রচিন্তা। চিৎপাবন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক থেকে আইআইটি আইআইএম মার্কা শানিত চেহারার তরুণ ভারতীয় যার সোচ্চার সমর্থক। এরা চায় নয়া উদারবাদী অর্থনীতি, যা তাদের 'অপরচুনিটি' দেবে বড়লোক হবার আর সেই বড়লোকত্ব যাতে হিন্দুভারতের জয়ধ্বজার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে তার ব্যবস্থাও থাকতে হবে একই সঙ্গে। রাশিয়ান ক্রোড়পতি যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে চার্চে যায় প্রতি রবিবার, এই ক্রোড়পতিও তেমনি গুরগাঁও-এর বিশাল ফ্ল্যাট থেকে মার্সেডিজ চেপে স্থানীয় 'সংকটমোচন' মন্দিরে যাবে সস্ত্রীক— মোদি তাদের দেবে এই ভারতবর্ষ।

এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে নরেন্দ্র মোদিকে এই হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সংবিধান থেকে 'ধর্ম নিরপেক্ষ' কথাটা তুলে দিয়ে। আদৌ তা নয়। এটা করা হবে গুজরাট মডেলে— 'সবক' শিখিয়ে শিখিয়ে। গুজরাটের বাইরে এই 'সবক' শেখানোর লাইনটা নিষ্ঠার সাথে সম্প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে মজফফরপুরে। ফল ফলেছে চমকপ্রদ। সব হিন্দু প্রার্থী দিয়েই মোদি উত্তরপ্রদেশ জয় করেছে। এই লাইন আরও প্রয়োগ করা হবে। নিঃশব্দ রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে এই দেশের সংখ্যালঘু শিখবে 'India that is Bharat' কী করে 'India that is Hindustan' হয়ে পড়ছে।

মোদি কি শেষ পর্যন্ত জিতবে এই 'সবক' শিখিয়ে শিখিয়ে প্যাটেল-শ্যামাপ্রসাদের লাইনে ভারতকে নতুন করে দাঁড় করাতে? আধুনিকতার বাহক যে বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তি, অনেকটাই নির্ভর করবে সেই শক্তিটি এদেশে কতটা শক্তিশালী থাকতে পারে, তার ওপর। বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তির বিস্তার এদেশে বিপুল। কংগ্রেসের মধ্যে নেহরু-ইন্দিরাপন্থীদের একাংশের মধ্যেও যেমন অচেতন বা অবচেতনভাবে আছে এই

রাজনৈতিক চিন্তা, অন্যদিকে এমনকি বস্তারের অরণ্যে যারা অন্য ভারত গড়ার সাধনায় মগ্ন তাদের মানসিক জগতেও আছে সেই বামপন্থী চিন্তা যা রাষ্ট্রকে করতে চায় ধর্মরহিত। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এগুলির সামগ্রিক সামাজিক প্রভাব বিপুল। মোদির ভারতচিন্তাকে রাজনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জ জানাবে এই শক্তিগুলি, যাদের ক্ষমতা এখনও খুব কম নয়। ভারতের সমাজে, বিশেষত হিন্দুসমাজের একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যেটিও মোদির এই ভারতনির্মাণ প্রকল্পের অন্তরায়। হিন্দুসমাজের মধ্যেই আছে বহু মত এবং বহু সংস্কৃতি, আছে জাতভিত্তিক বিভাজন, যা অতিক্রম করে 'একধর্মরাজ্যপাশে' এমনকি সেই ভারতকেও একসূত্রে গেঁথে ফেলা এক কঠিন কাজ, অতীতে যা কখনও সফল হয়নি। ভারতের সমাজের মধ্যেই আছে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ, এমনকি এদেশের ইসলাম ধর্মও যাকে ভাঙতে পারে নি, বাংলার ইসলাম আর পাঞ্জাবের ইসলাম যে কারণে একসাথে থাকতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-নেহরু-আবুল কালাম আজাদ এটা ভালো-ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। নেহরুর রাষ্ট্রচিন্তা যে ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছিল, তার বস্তুগত কারণও এটাই।

এই বাস্তবতাই মোদি কিংবা চিৎপাবন ব্রাহ্মণ, কিংবা আইআইটি-আইআইএম শিক্ষিত তরুণের ভারতচিন্তার অন্তরায় হয়ে কাজ করবে, বামশক্তি যার সুযোগ নিতে পারে। একটাই আশঙ্কা। এদেশে কিছু মূর্খ মুসলিম ধর্মগুরু আছে, আছে কিছু মুসলিম মৌলবাদী যারা এই মোদির হিন্দুত্বর বিরুদ্ধে পাক আইএসআই এবং পাক সেনাবাহিনীর মদতে কিছু উস্কানিমূলক কাজ করতে পারে, পাল্টা 'সবক' শেখানোর নামে। আইএসআই ও পাক সেনাবাহিনীর স্বার্থ আছে এই উস্কানিদানে, কারণ তাদের অস্তিত্বই নির্ভর করে দুই ধর্মভিত্তিক উত্তেজনা বৃদ্ধির মাত্রার ওপর। এদেশের মুসলিম সমাজকে বুঝতে হবে, এসবের সঙ্গে তাদের স্বার্থের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁদের বাঁচিয়ে রাখবে বহুত্ববাদী ভারত— এই উস্কানিগুলি যাকে দুর্বল ক'রে মোদির ভারত নির্মাণের ন্যায্যতা আনে। বাঁচার জন্য তাঁদের নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হবে ধর্মরহিত রাজনীতি, বাম রাজনীতিই যা নিশ্চিত করে।

মুর্শিদাবাদের কান্দী থেকে প্রকাশিত
সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজভাবনা-র মাসিক পত্রিকা

অঙ্গাঙ্গী

সম্পাদক : অপরেশ চট্টোপাধ্যায়, কুণালকান্তি সিংহরায়
যোগাযোগ : সম্পাদক, কান্দী মোহনবাগান
(পাওয়ার হাউসের নিকট)
কান্দী, মুর্শিদাবাদ, ৭৪২ ১৩৭
দূরভাষ : ৯৭৩৫৬২০২৬১, ৯৪৩৪৪৩১৫০০

সংসদীয় নির্বাচন ও গণতন্ত্র

১৮ পৃষ্ঠার পর

এবং দেখা যাচ্ছে, রাজনীতির কারবারে এসে এই সম্পদশালীরা তাঁদের সম্পদ কয়েকগুণ বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছেন। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের এই যুগে সবকিছুই যখন পণ্যায়িত, রাজনীতিকেও পণ্য-সামগ্রীর মতোই বিপণনের বন্দোবস্ত পাকা করা হয়েছে ভারতীয় 'মহান' গণতন্ত্রে। বিশেষ ব্র্যান্ডের পণ্যের মতোই পুঁজির জোরে বিশেষ ব্র্যান্ডের নেতা ও দলকেও সফলভাবে বাজারজাত করা সম্ভব, এবারের সংসদ নির্বাচন বোধকরি সেই সাক্ষর রাখলো।

সূত্র :

১. www.eci.nic.in
২. Times of India ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪।
৩. Association for Decocratic Reforms সংগৃহীত এই তথ্যগুলো ১০ মে ২০১৪-তে ছাপা হয়েছে।
৪. Times of India ১৭ মে, ২০১৪।
৫. Times of India ২৯ মে, ২০১৪।
৬. Times of India ২৮ মে, ২০১৪।
৭. NSSO Survey 2004-05 ও www.censusinindia.gov.in.website থেকে সংগৃহীত।
৮. Times of India ২৮ মে, ২০১৪। এই হিসেবে একজন শিখ সাংসদ, স্মৃতি ইরানি ও মানেকা গান্ধীকে ধরা হয়নি।
৯. Trilochan Sastry, 'Towards Decriminalization of Elections and Politics', *Economic and Political Weekly*, January 4, 2014.

জনসংঘ থেকে বিজেপি

২৭ পৃষ্ঠার পর

অস্বীকার করলেও সরকারের চাপে শেষ পর্যন্ত তারা ঐ টাকা দিতে বাধ্য হয়। গুজরাট সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় আদানি গোষ্ঠী ভারতের আইন অমান্য করে ১২০০ হেক্টর চারণভূমি বিনা পয়সায় দখল করে ব্যবসার কাজ চালাচ্ছে। এরা ভারতের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বন্দর অত্যন্ত লাভজনক ভাবে পরিচালনা করে। লাভের আসল কারণ, গুজরাট সরকার তার নিজস্ব সরকারি বন্দর কম দামে ব্যবহার না করে আদানির বেসরকারি বন্দর বেশি দামে ব্যবহার করে। গুজরাট মডেলের মর্মবস্তু হলো সরকারি সম্পত্তি বেসরকারি সংস্থাকে হস্তান্তর আর করদাতা জনতার টাকায় কর্পোরেটদের ভরতুকি দেওয়া। আম্বানি-আদানীরা তাই এত খুশী। খুশী বিদেশি বিনিয়োগকারী আর্থিক সংস্থাবৃন্দ। ব্যাঙ্ক-বেসরকারিকরণ, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত উৎপাদন সংস্থায় ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ, আর্থিক নিয়ন্ত্রণের সরকারি সংস্থাগুলি গুটিয়ে নেওয়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গুরুত্ব হ্রাস আগামী দিনে ভারতকে অর্থনৈতিক দিক থেকে হত্যালীলার শিকার করে তুলবে। মোদি মডেলে এবার বুঝি সারা ভারত জুড়ে আম্বানি-আদানিরাই আম আদমিদের দাবিয়ে রাখবে।

স্মরণ

সুনীতি কুমার ঘোষ

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকে সত্তর দশকের নকশালবাড়ী আন্দোলন পর্যন্ত যাঁরা রাজনৈতিক সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন, তাঁরা একে একে কালের নিয়মে প্রয়াত হচ্ছেন। তাঁদের প্রয়াণে ছিন্ন হচ্ছে অতীত আন্দোলন আর বর্তমান প্রজন্মের সামনে উদ্যত সংকটের মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতার যোগসূত্রটি। এমনই এক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ, শ্রী সুনীতি কুমার ঘোষ প্রয়াত হলেন ৯৬ বছর বয়সে— গত ১১ মে, ২০১৪ আসানসোলের এক নিষ্করুণ নিদাঘের বিকেলে।

সুনীতি কুমার ঘোষের জন্ম রুশ বিপ্লবের পরের বছর, ফেব্রুয়ারি ১৯১৮। প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অভিজ্ঞতা-সম্পৃক্ত যে কিশোরটি পরিণত বয়েসের দিকে পা রাখছিলো, সেই কিশোরের উন্মেষিত চেতনা ক্রমে তাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শিবিরে ঠেলে দেয়। হাওড়ার স্থানীয় স্কুল, বি কে পাল ইনস্টিটিউশন এবং কলকাতার সেন্ট পল্‌স কলেজ থেকে ইংরাজির স্নাতক সুনীতি কুমার ঘোষ ১৯৩৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি ভাষা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

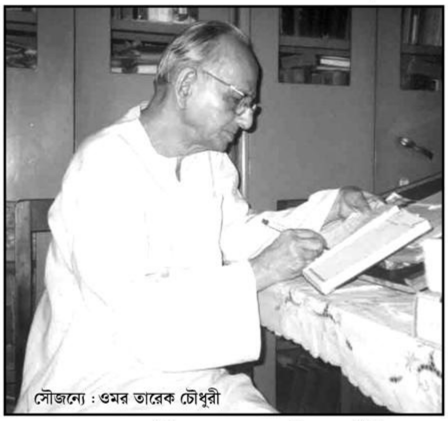

সৌজন্যে : ওমর তারেক চৌধুরী

প্রগতি-মনস্ক রুচিবান মানুষরা সে কালে প্রায়শই অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। সুনীতি ঘোষও এই নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে বাংলা-বিহার মিলিয়ে প্রায় ১১টি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জেলা দিনাজপুর-এর কলেজে অধ্যাপনার সময় (১৯৪৬-১৯৪৯) তিনি চলমান তেভাগা আন্দোলনে যুক্ত হন। তেভাগার আন্দোলনে প্রচারের কাজে তাঁর এক মুখ্য ভূমিকা ছিলো। পুলিশী অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছালে ঐ অঞ্চলে কৃষকদের সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য গঠিত হয় কৃষক সহায়ক কমিটি। সুনীতি ঘোষ সেই কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক মুখপত্র 'পরিচয়' পত্রিকায় তেভাগা নিয়ে তাঁর এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

কমিউনিস্ট আন্দোলনে সক্রিয় থাকার কারণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাঁকে দিনাজপুর থেকে বহিষ্কার করে। তিনি কলকাতায় এসে বারাসাত সরকারি কলেজ অধ্যাপনার কাজ নেন। কিন্তু পুলিশের রিপোর্ট-এ তাঁর কমিউনিস্ট অতীতের বিষয়টি প্রকাশ পেলে সরকারের প্রতিনিধি তাঁকে মুচলেকা দিতে বলে। যদিও কমিউনিস্ট পার্টির নানা কার্যকলাপের বিরোধিতা করায় সুনীতি ঘোষ তখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাঁর কমিউনিস্ট অতীতকে অস্বীকার করতে চাননি। মুচলেকা দিতে না চাওয়ায় তাঁকে চাকরি হারাতে হয়। তিনি পরে কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে চাকরি নেন।

১৯৫৩-তে সুনীতি ঘোষ ইন্দো-সোভিয়েত কালচারাল সোসাইটি বা ইস্‌কাস্‌-এর কলকাতা শাখার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুবাদে তিনি আবার পার্টির কাজে যুক্ত হন। সোভিয়েত সরকারের নানান ধরনের সাফল্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন প্রচারমূলক সভ্য সংগঠিত করা এবং প্রচার পুস্তিকা লেখার কাজে এই সময় তিনি ব্যস্ত থাকেন। ক্রুশ্চেভ এবং বুলগানিন-এর কলকাতা সফরের সময় প্রকাশিত প্রচারমূলক পুস্তিকাগুলির মুখ্য লেখক ছিলেন সুনীতি ঘোষ।

স্তালিনের মৃত্যু এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের পর সমগ্র কমিউনিস্ট দুনিয়ায় যে ঝড় ওঠে তার ঢেউ ভারতেও এসে পৌঁছায়। শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ এবং স্তালিনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর যে সোভিয়েত সংস্কৃতি চালু হয়, তার বিরুদ্ধে সরব হয়ে অন্য অনেকের মতো সুনীতি ঘোষও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ ছেড়ে দেন।

১৯৬২-র ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট চিন্তাধারার দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্যে আনে। ১৯৬২-৬৩-র ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে কিছু গণ-আন্দোলনের কর্মী, বুদ্ধিজীবী এবং অধ্যাপকদের নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে একটি গোপন গোষ্ঠী তৈরি হয়। এই গোষ্ঠীটি ভারতের মুক্তির পথ নিয়ে গভীর অধ্যয়ন শুরু করে। ভবিষ্যৎ সিপিআই(এম) পার্টির নেতারা ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধের শেষে

কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে এই গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন।

এরপর ইংরাজি কাগজ, *পিপলস্ ডেমোক্রাসি*, প্রকাশ শুরু হয়। ঐ পত্রিকায় সুনীতি ঘোষ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মুক্তি আন্দোলনের বিষয়ে নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ই এম এস নামবুদিরিপাদ এই কাগজে ভারতীয় জওয়ানদের জন্য রক্তদানের জন্য ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাছে আহ্বান রাখেন। তার কিছু আগে-পরে সুন্দরায়া লেখেন যে, যদিও পুলিশ ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জানাচ্ছে যে সিপিআই-এম পার্টি গোপনে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছে, কিন্তু সত্যি বিষয় হলো সিপিআই-এম পার্টি সংবিধান মেনে সংসদীয় পথেই কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলে উৎসাহী।

সদ্য গঠিত সিপিআই-এম তখন নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। নামবুদিরিপাদ এবং সুন্দরায়ার লেখা এবং অন্যান্য আরও মৌলিক বিষয় নিয়ে পার্টির অভ্যন্তরে এবং বাইরে বিতর্ক চলতেই থাকে। সুনীতি ঘোষ এই সমস্ত প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর চেয়ে পার্টির সম্পাদক শ্রী প্রমোদ দাশগুপ্তকে এক দীর্ঘ চিঠি পাঠান। তখন তিনি সিপিআই-এম পার্টির কলেজ শিক্ষক ইউনিটের সদস্য। উত্তরের আশায় দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে এক সময় (১৯৬৬-র এপ্রিল-মে) তিনি *পিপলস ডেমোক্রাসি* দপ্তরে যাওয়া এবং লেখা দেওয়া বন্ধ করে দেন।

১৯৬৫-১৯৬৬-তে ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কলকাতায় অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির পক্ষ থেকে যাবতীয় প্রচারমূলক কাজ সামলান সুনীতি ঘোষ। এই সময় ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ভিয়েতনাম-এর মুক্তিযুদ্ধর বিষয়টি ব্যাখ্যা করে একটি বড় পুস্তিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম ভিয়েতনাম সম্পর্কে একটি তথ্যনিষ্ঠ পুস্তিকা— এটি লেখেন সুনীতি ঘোষ। এক বছরে ১২ হাজার কপি মুদ্রিত হয়ে নিঃশেষিত হয়ে যায়।

খাদ্য আন্দোলনের সময় (১৯৬৬) বাংলাদেশের চারিদিকে যে স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ শুরু হয়, তার রেশ ধরে বাংলার সমাজে সমাজ-বিপ্লবের মত ও পথ নিয়ে আবারও এক দফা গভীর বিতর্ক শুরু হয়। সংস্কৃতির মান্য পত্রিকা 'এক্ষণ' এই সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-টীকা সহযোগে 'শব্দ-কোষ' আঙ্গিকে প্রবন্ধ প্রকাশ শুরু করে। রাজনৈতিক দিক থেকে বিপরীত অবস্থানের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এই পত্রিকায় 'সাম্রাজ্যবাদ' বিষয়ে আকর-প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য সুনীতি ঘোষকে আহ্বান জানানো হয় এবং প্রবন্ধটি 'এক্ষণ'-এর বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের প্রাক্কালে, অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, সরোজ দত্ত, প্রমোদ সেনগুপ্ত, অসিত সেন এবং আরও কিছু বিদগ্ধ মানুষের পাশাপাশি সুনীতি ঘোষ-ও 'কালপুরুষ' পত্রিকায় যোগ দেন। পত্রিকায় তাঁর সব কটি লেখাই প্রকাশিত হয় ছদ্মনামে। এই পত্রিকা প্রকাশের প্রাথমিক উদ্যোগে তহবিলের ৪০০ টাকা দেন সুনীতি ঘোষ, যা পত্রিকার বিক্রির পর তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়। এই পত্রিকায় তাঁর উল্লেখযোগ্য মৌলিক প্রবন্ধ হলো ঘানা-র নক্রুমা-র ওপর একটি লেখা।

মে ১৯৬৭তে ঘটলো নকশালবাড়ির কৃষক-নিধন পর্ব। *কালপুরুষ* সম্পাদকমন্ডলী যেহেতু আগে থেকেই সিপিআই-এম-এর রাজনৈতিক দিশা এবং কার্যক্রম নিয়ে সন্দিহান ছিলেন, তাই তাঁদের পক্ষে নকশালবাড়ির কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করার বিষয়ে দ্বিধা ছিলো না। নকশালবাড়ির ঘটনার পরপরই গড়ে ওঠে এই কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে একটি কৃষক সহায়ক কমিটি— পরে সারা ভারত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সুনীতি ঘোষ এই কো-অর্ডিনেশনের নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন।

১৯৬৭-তে প্রকাশিত হয় কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সর্বভারতীয় ইংরাজি মাসিক, 'লিবারেশন'— সুনীতি ঘোষ ছিলেন তাঁর সম্পাদক। ১৯৬৯-এর ১লা মে ভারতের তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, সিপিআই (এম-এল) গঠিত হলে, সেই পার্টির উচ্চতম কমিটিতে ছিলেন সুনীতি ঘোষ— 'লিবারেশন' পার্টির মুখপত্রে পরিবর্তিত হলে তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদনার কাজ চালাতে থাকেন।

নব গঠিত কমিউনিস্ট পার্টিটি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় অবদমনের শিকার হয়। ফলে পার্টির সাংগঠনিক ধাঁচ ছিলো আধা-গোপন। পার্টির সম্পাদক চারু মজুমদার, পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রায় প্রথম দিন থেকেই আত্মগোপনের জীবন বেছে নিতে বাধ্য হন। চারু বাবুর জন্য সুরক্ষিত গোপন বাসস্থান ঠিক করা এবং তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের নিয়মিত সম্পর্ক বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব পার্টি সুনীতি ঘোষের ওপরই অর্পণ করে। চারু মজুমদারের গ্রেপ্তারের আগের মাস পর্যন্ত এই গুরু দায়িত্ব সুনীতি ঘোষ অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং সাফল্যের সঙ্গে পালন করে গেছেন।

পার্টির মধ্যে একটা সময়ে ঠিক হয় যে প্রচারকার্য আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পার্টির একটি নিজস্ব রেডিও স্টেশন স্থাপন করা প্রয়োজন। এই বিষয়েও রূপায়ণের প্রধান দায়িত্ব বর্তায় সুনীতি ঘোষের ওপর। পুলিশের নজর এড়িয়ে বিশাল রেডিও ট্রান্সমিটার নির্মিত হয়, কিন্তু পার্টি বিভিন্ন বিপর্যয়ের মুখে পড়ায় রেডিও স্টেশনের পরিকল্পনাটি সামরিকভাবে বাতিল হয়ে যায়।

বিদেশের কমরেড এবং সমমনস্ক পার্টিগুলির সঙ্গে আদান-প্রদান ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন

সুনীতি ঘোষ। আলবেনিয়া-র লেবার পার্টির মুখপত্র, জেরি-ই-পপুলি-র আমন্ত্রণে, 'লিবারেশন' সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে গোপনে আলবানিয়া পৌঁছোন সুনীতি ঘোষ। তাঁর এই সফরের বিস্তারিত বিবরণ মিলবে তাঁর সর্বশেষ বই, *নকশালবাড়ি—একটি মূল্যায়ন* নামক গ্রন্থে।

চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর নব-গঠিত কমিউনিস্ট পার্টিটিও দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং পার্টির মধ্যে সার্বিক ঐক্য বিঘ্নিত হয়। এই পর্যায়ে পার্টির একদল নেতা ও কর্মীবৃন্দ একজোট হয়ে পার্টির বিপর্যয়ের জন্য চারু মজুমদারের প্রদর্শিত দিশা নাকচ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পার্টি পুনর্গঠনের নানা প্রক্রিয়ার একটি প্রক্রিয়া ছিলো সুনীতি ঘোষের নিজের উদ্যোগে। তিনি সমমনস্ক কমরেডদের এক জায়গায় জড়ো করে সিওসি, সিপিআই(এম-এল) নামের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ঐক্য প্রচেষ্টায় তাঁর এই দীর্ঘ অনুশীলন শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়নি।

একদিকে তিনি যখন অন্তরালে থেকে ফলিত রাজনীতির অনুশীলন করছেন, পাশাপাশি তিনি এমন প্রতিকুল অবস্থাতেও ছদ্মনামে নকশালবাড়ি আন্দোলন সম্পর্কে, চারু মজুমদারের ভূমিকা সম্পর্কে সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। ১৯৭৭-এ জনতা পার্টি সরকার গঠন করলেও, বন্দিমুক্তি এবং রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি থাকলেও তা রূপায়ণের বিষয়ে কালক্ষেপ চলতেই থাকে। সুনীতি ঘোষের বিরুদ্ধে বহু মামলা থাকায় তাঁর অন্তরালের জীবন-যাপন দীর্ঘায়িত হতে থাকে। বস্তুত তিনি এই সময় থেকেই নকশালবাড়ি আন্দোলন, ভারতের বুর্জোয়াদের শ্রেণী চরিত্র, ভারতের মুক্তির পথ ইত্যাদি নিয়ে গভীর গবেষণায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র-বিরোধী যাবতীয় মামলা প্রত্যাহৃত হওয়ার কিছুকাল পর তিনি আবার তাঁর নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং তাঁর গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করার কাজে হাত দেন। এই সময় থেকে আমৃত্যু তিনি অক্লান্তভাবে ১১টি মুখ্য পুস্তক, প্রায় ১০টি মধ্যম মাপের পুস্তিকা এবং বহু অগ্রন্থিত প্রবন্ধ লিখে গেছেন।

অবহেলিত-বঞ্চিত মানুষদের সংগঠিত করার যে প্রয়াসে সুনীতি ঘোষ আজীবন নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন, সেই প্রয়াসের ধারাবাহিকতায় তিনি এই নিপীড়িত জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের ইতিহাস, রাজনীতি-সমাজনীতি বিশ্লেষণের এক ভিন্ন বিপ্লবী ধারার জন্ম দিয়েছেন। তাঁর রচনা দুই বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস চর্চার ধারাকে পুষ্ট করেছে। আমস্টারডাম-এ কমিউনিস্ট আন্দোলনের কথক-ইতিহাসের যে মহাফেজখানা রয়েছে, সেখানে সুনীতি ঘোষের এক সুদীর্ঘ ভিডিও সাক্ষাৎকার রয়েছে। ভবিষ্যতে যাঁরা ভারতীয় বিপ্লবের ইতিহাস রচনায় হাত দেবেন, তাঁদের কাছে এই আকর-উৎসটি অমূল্য বলে বিবেচিত হবে।

সত্তরের আন্দোলনে বিপর্যয় নেমে এলে নানা দিক থেকে এই আন্দোলনের মূল বিষয়গুলিকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। সুনীতি কুমার ঘোষ এই আন্দোলনের একজন অন্দরমহলের মানুষ হিসেবে যে সমস্ত সাহসী আত্মসমালোচনা-মূলক লেখা ছদ্মনামে ইংরেজি পত্রিকায় লিখেছিলেন, *অনীক* পত্রিকা তার কয়েকটি অনুবাদ করে প্রকাশ করে।

ভারতের ইতিহাস এবং দেশের বৃহৎ বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রবন্ধ, বা মার্কস নিয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলি বিদেশের মান্য পত্রিকা সাদরে পত্রস্থ করেছে। *মান্থলি রিভিউ*, *বুলেটিন অফ কনসার্নড এশিয়ান স্কলারস* ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর বিভিন্ন লেখা ছড়িয়ে রয়েছে। *ফ্রন্টিয়ার*, *ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি* বা *আসপেক্টস অফ ইন্ডিয়ান ইকনমি*, *অনীক* পত্রিকায় রয়ে গেছে আরও অনেক মূল্যবান লেখা।

সুভাষচন্দ্রের মূল্যায়ন নিয়ে তাঁর রচনা সাবেকি কমিউনিস্ট ঘরানার রক্ষণশীল সীমারেখা অতিক্রম করে বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। এই প্রবন্ধটিতে কংগ্রেস রাজনীতি এবং সুভাষচন্দ্রের সমসাময়িক নানান কংগ্রেসী নেতা, নেহরু ইত্যাদিদের নিয়ে যুক্তিপূর্ণ শ্লেষোক্তি থাকায় প্রবন্ধটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী-র পত্রিকা, বিশ্বভারতী কোয়াটারলিতে প্রকাশিত হতে পারে কিনা সে বিষয়ে ভারতের সংসদে পর্যন্ত বিতর্ক ওঠে। কিন্তু তাঁর লেখার সংযম, ক্ষুরধার যুক্তি, তথ্য-তত্ত্বের কাছে ভারতের সাংস্কৃতিক রক্ষীবাহিনীর তলোয়ার শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয়— প্রবন্ধটি অবিকৃত অবস্থায় প্রকাশিত হয়।

বয়েসে পরিণত এবং বয়েস-জনিত স্বাস্থ্যহানিতে পীড়িত হওয়া সত্ত্বেও সুনীতি ঘোষ জাতীয়-আন্তর্জাতিক কোনও সমসাময়িক বিষয়ে যোগ দিতে দ্বিধা করেননি। মার্কিন দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় ইরাক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি কনভেনসনে অসুস্থ শরীরেও উপস্থিত থেকেছেন। বন্দিমুক্তি আন্দোলনে যখনই তাঁর সাক্ষর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে, তা দিতে তিনি কখনও দ্বিধা করেননি। অনেক বিপ্লবীকে তিনি অর্থ সাহায্য করেছেন নিয়মিত, আর্থিক দিক থেকে পেছিয়ে পড়া মেধাবী ছাত্ররাও তাঁর আর্থিক সাহায্যে পড়া চালিয়েছে।

দেশ-বিদেশের নানান মানুষদের সঙ্গে তিনি চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর বই বাংলাদেশেও প্রকাশিত হয়েছে। এলাহাবাদের বেসরকারি বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র, সোস্যাল সায়েন্স এ্যাকাডেমি তাঁকে সম্মানিত করেছে।

চৌম্বক ব্যক্তিত্বের অধিকারী, নীতিতে দৃঢ় অথচ মিষ্টভাষী এবং আন্তরিক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

এর পর ৩৬ পৃষ্ঠায়

স্মরণ

অমলেন্দু দে : সর্বজনের ঐতিহাসিক

সুস্নাত দাশ

অধ্যাপক অমলেন্দু দে সম্প্রতি প্রয়াত হলেন। ১৬ মে ২০১৪ তারিখে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ যখন এক নতুন আশঙ্কার পথে দ্রুত ধাবমান, তখন প্রায় ৮৫ বছরের জীবন সংগ্রাম থেকে অব্যাহতি নিয়ে কলকাতার এক নার্সিংহোমে সুদীর্ঘকালের পথ চলা শেষ হল তাঁর। রেখে গেলেন ছয় দশকের সাথী ও সহচরী রোগশয্যায় শায়িতা স্ত্রী নাসিমা বেগমকে। সমাজের প্রতি তিনি দায়বদ্ধ মৃত্যুর পরেও। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর দেহ ও চক্ষু দান করে গেছেন।

অমলেন্দু দের জন্ম ১৯৩০ সালে বর্তমান বাংলাদেশের মাদারিপুরে। তাঁদের পরিবার ছিল রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্ত পরিবার। তাঁর পিতা গোপালচন্দ্র দে। মাদারিপুরে অমলেন্দু দে-র পরিবার গোপনে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। পূর্ণচন্দ্র দাসের অনুগামীরা এবং অনুশীলন সমিতির সদ্যসরা যাঁরা আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী ছিলেন তাঁরা অনেকেই জেলখানাতেই কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এঁদের সঙ্গে তাঁর পরিবারের যোগাযোগ অটুট ছিল। অমলেন্দু দের পিতা গোপালচন্দ্র বিনা পারিশ্রমিকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মামলাগুলির দেখাশুনা করতেন। এইভাবেই ছোটবেলা থেকে অমলেন্দু বামপন্থী মতাদর্শ ও কর্মধারার সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের গৃহে অবশ্য শুধু কমিউনিস্টরা নয়, বহু স্থানীয় কংগ্রেস ও বিপ্লবী দলের নেতারাও আসা যাওয়া করতেন।

মাদারিপুরে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই কিশোর অমলেন্দু কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। বস্তুত পক্ষে মাদারিপুর ছিল কমিউনিস্ট পার্টির একটি শক্ত ঘাঁটি। ১৯৪২-৪৩ সালে অমলেন্দু দে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন ও কিশোর বাহিনীর কাজে নিজেকে যুক্ত করেন। মাদারিপুর সাব ডিভিশনে তিনি কিশোর বাহিনীর সম্পাদক ছিলেন। যখন তিনি নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্র, তখনই বাংলার গ্রাম অঞ্চলে শুরু হয়ে গেছে তেভাগা কৃষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত। এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তরুণ অমলেন্দু। শুধু তাই নয়, ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ দাঙ্গা ও দেশবিভাগের ঝড়ঝাপটা তাঁর এবং তাঁদের পরিবারকে সামলাতে হয়।

১৯৪৬ সালে মাদারিপুর ইংলিশ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অমলেন্দু দে কলকাতায় চলে আসেন। তিনি ভুলতে পারেননি যে এইসময় তাঁর বাবা তাকে মস্কো থেকে প্রকাশিত একটি বই উপহার দিয়েছিলেন, যা ছিল তাঁর সারা জীবনের সম্পদ 'History of the Comminist Party of Soviet Union'।

কলকাতায় বিএ পড়ার সময়েই অতিরিক্ত পরিশ্রম, অনিয়ম ও অপুষ্টিজনিত অসুস্থতার কারণে আরজিকর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। দীর্ঘদিন হাঁটা চলার ক্ষমতা ছিল না। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কোনোক্রমে তিনি মাদারিপুরে বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু মাদারিপুর তখন সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে উত্তপ্ত এবং পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ এই সময় খুঁজে খুঁজে কলকাতা থেকে আসা কমিউনিস্ট কর্মীদের গ্রেপ্তার করা শুরু করে। খবর পেয়ে অমলেন্দুর পিতা তাকে কিছু টাকাপয়সা সহ কলকাতায় চলে যাবার ব্যবস্থা করে দেন।

১৯৫১ সালে অমলেন্দু দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে এমএ ক্লাশে ভর্তি হন। অমলেন্দু দের মামা সতীশচন্দ্র দে, যিনি সে সময় বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তিনি এবং অমলেন্দু দের কাকা নেপালচন্দ্র দে সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন এবং সকলে একত্রে উত্তর কলকাতায় শ্যামবাজারের কাছে একটি পরিত্যক্ত মসজিদে আশ্রয় নেন। অমলেন্দু দে-কে স্থানাভাবে এই মসজিদের বারান্দায় অবস্থান করে পড়াশুনা চালাতে হচ্ছিল। এখানে থাকাকালীন মসজিদের ইমামকে একাধিকবার দে-পরিবার দাঙ্গাবাজদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। একসময় তাঁদের সেই মসজিদের আশ্রয় ছাড়তে হয়। আশ্রয়ের জন্য তাঁকে কিছুদিন উত্তর কলকাতার মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের একটি ক্লাসরুমেও রাত কাটাতে হত। তখন তিনি ছাত্র-ফেডারেশনের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী।

১৯৫৩ সালে ইতিহাসে এমএ পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এমএ ক্লাসে তাঁর সহপাঠিনী ছিলেন নাসিমা বানু, যিনি পারিবারিক সূত্রে ১৯৪০-এর দশকে বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও কৃষক-প্রজা দলের নেতা জনাব ফজলুল হকের সম্পর্কিত দৌহিত্রী। ১৯৫৫ সালে তাঁরা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁরা ছিলেন সদ্য চালু হওয়া স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্টের (১৯৫৪) দ্বারা প্রথম বিবাহিত দম্পতি। সহজেই অনুমেয়, সেই সময়ে এজাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতখানি সাহসের প্রয়োজন হত। সম্পন্ন পরিবারের মেয়ে নাসিমাকেও চাল-চুলোহীন স্বামীর ঘর করতে খুবই সমস্যায় পড়তে হত। কিন্তু দুজনের মিলিত প্রয়াসে সব সংকট তাঁরা পার হয়ে যেতে পেরেছিলেন।

অমলেন্দু দে ১৯৫৪ সালেই হাওড়ার উলুবেড়িয়া কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। এসময় পশ্চিমবঙ্গ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তিনি যুগ্ম-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে অমলেন্দু দে-কে নানাবিধ বৈষম্য ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে অধ্যাপক দে দক্ষিণ কলকাতার মুরলীধর কলেজে লেকচারার পদে যোগদান করেন। এই সময় তিনি রাজ্য-

মহাফেজখানা ও জাতীয় গ্রন্থাগারে গভীর অধ্যয়নে লিপ্ত হন নিজের গবেষণার প্রয়োজনে। বিভিন্ন বিখ্যাত জার্নাল ও পত্রপত্রিকায় তাঁর রচনা ও নিবন্ধাদি এইসময় প্রকাশিত হতে শুরু করে। সুবক্তা ও বাগ্মী রূপেও তিনি ক্রমশ বুদ্ধিজীবী মহলে পরিচিত হতে থাকেন। ১৯৬২-তে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে তিনি একবার রাজনৈতিক কুৎসার শিকার ও প্রায় গ্রেপ্তার হওয়ার সম্মুখীন হন। ঘটনা হলো, ভারত-চীন সীমান্ত-সংঘর্ষের বিষয় নিয়ে অমলেন্দুবাবু নানা সভা-সমিতি ও সেমিনারে ভাষণ দেন। তাতে তিনি নিজের অভিমত প্রকাশ করে জানান যে সীমানা নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলে তা সেই দুই দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় সমাধানের জন্য দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসা উচিত। একজন ইতিহাসকার শিক্ষাবিদের এধরনের অভিমত প্রকাশের স্বাধীনতা অনস্বীকার্য, কিন্তু তা নিয়ে জল ঘোলা হতে শুরু হয়েছিল।

১৯৬৩ সালে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি এই বিভাগে সসম্মানে গুরু নানক অধ্যাপদ পদেও বৃত হয়েছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি দ্রুত তিনি ছাত্রছাত্রীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। নিজে গবেষণা কর্মে লিপ্ত হন, অন্যদেরও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। ১৯৭০ সালে অমলেন্দু দে-র একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকার্য 'খাকসার আন্দোলনের ইতিহাস' জাপানী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশ পায়। তিনি ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থটির একটি বৃহৎ সংস্করণ ১৯৭৫ সালে 'Khaksar Movement in India' নামে প্রকাশ করেন। কাজটিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট উপাধির জন্য প্রদান করেন। এর পূর্বে পিএইচডি না থাকা কেউ এই সম্মানজনক ডিগ্রীর অধিকারী হন নি।

অধ্যাপক অমলেন্দু দে শুধু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বাণী-বাহক। তাঁর সমগ্র পরিবারই ছিল এই পথের পথিক। দেশভাগের বেদনা সারা জীবন অধ্যাপক দে মর্মে বহন করে নিয়ে বেড়িয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন অখণ্ড ভারতবর্ষ; তা হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন অবিভক্ত বাঙলা, তাও হয়নি। তিনি সর্বদা চাইতেন হিন্দু-মুসলমান দেশের দুই সম্প্রদায় যেন মিলেমিশে থাকে; এই পোড়ার দেশে তা ঘটলো কোথায়? তবুও হতাশ না হয়ে তিনি তাঁর গবেষণা ও ইতিহাস-চর্চার মধ্যে দিয়ে সাম্প্রদায়িক-মৈত্রীর পথ সদা-সর্বদা খোঁজার চেষ্টা করে গেছেন। ভারতবর্ষের বহুত্ববাদী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মেল-বন্ধনের প্রধান প্রধান উপাদান ও উদাহরণগুলি তুলে ধরাই ছিল ঐতিহাসিক রূপে তাঁর প্রধান কর্তব্য, এবং তা তিনি সুসম্পন্ন করতেন সংখ্যাগুরুর সমস্ত প্রকার ভয়-ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করে। তাঁর সুবিখ্যাত সন্দর্ভ 'Roots of Separatism in Nineteenth Century Bengal' (1974) এবং পরে বিভিন্ন সময়ে রচনা করেন 'Religious Fundamentalism and Secularism in India' (1996), 'Mahatma Gandhi and Islam' (2000), 'Islam in Modern India' (2003) সহ সাম্প্রায়িকতা প্রশ্নে প্রায় এক ডজন মূল্যবান বাংলা গ্রন্থ এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক নানা জার্নালে প্রকাশিত অন্তত অর্ধশত অ্যাকাডেমিক পেপার এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা বিষয়ে প্রকাশিত রচনার সংখ্যাও প্রায় অর্ধশত। বাংলা বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক* (১৯৭২), *বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ* (১৯৭২), *স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা : প্রয়াস ও পরিণতি* (১৯৭৫), *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী* (১৯৮১), *ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা* (১৯৯২), *প্রসঙ্গ : অনুপ্রবেশ* (১৯৯৩), *দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও মুসলিম লীগ* (২০০২), *ইতিহাস চিন্তায় ধর্মীয় আবেগ প্রবণতা* (২০০২) প্রভৃতি। কয়েকটি মূল্যবান প্রকাশনা তিনি সম্পাদনা করেন, যেমন ইংরাজিতে 'Gandhi Jinnah Correspondence and Communal Questions' (Ed. 1999), History and Doctrines of the Wahabis by Abdullah (2004), Theological Discourses in Indian History (2004); বাংলা ভাষায় কোরাণ চর্চা (১৯৯৯) প্রভৃতি। প্রসঙ্গত, ভারতবর্ষে নবজাগরণের প্রবর্তন উনবিংশ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছে বলে অধ্যাপক দে মনে করেননি; সপ্তদশ শতাব্দীর সুফি-সাধকদের সাধনা, ভারতে শাহজাদা দারাশুকোর ভূমিকাকে তিনি বিশেষ প্রাসঙ্গিক মনে করতেন। দারাশুকো-কে নিয়ে তিনি গবেষণা-মূলক কাজ করেছিলেন। 'Dara Shukon as an Exponent of Communal Harmony in India' *(Jounal of Indian Research Institute,* Calcutta, Jan-June, 1976) বাংলার কৃষক সংগ্রাম বিশেষত নীল বিদ্রোহ ছিল অধ্যাপক অমলেন্দু দে-র বিশেষ আগ্রহের বিষয়। বেশ কয়েকটি নিবন্ধ তিনি এই বিষয়ে লিখেছেন। বর্তমান নিবন্ধ-লেখকের সম্পাদনায় 'যুক্তবঙ্গে নীলচাষ : নীলবিদ্রোহের ইতিহাস' শীর্ষক যে বৃহৎ গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে তাতে তিনি রোগ-শয্যা থেকেও তাঁর একটি মূল্যবান নিবন্ধ নির্বাচিত করে দিয়েছিলেন।

অধ্যাপক অমলেন্দু দে-র আরো একটি আগ্রহের বিষয় ছিল বিপ্লববাদী আন্দোলন এবং ভারত-চীন এবং ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী। যাদবপুরের কাছে সূর্য সেন ভবনে চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থার (বিপ্লবী গণেশ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত) তিনি ছিলেন অন্যতম প্রাণপুরুষ এবং দীর্ঘদিনের সভাপতি। একইভাবে তিনি ছিলেন All India-China Friendship Association-এর সহ-সভাপতি। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতিরও একদা প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। এছাড়া তাঁর লেখা *সূর্য সেন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম* (সম্পাদিত, ১৯৫৫); *প্রভাত চক্রবর্তী : অনুশীলন সমিতি থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে* (২০০২) গুরুত্বপূর্ণ। চীন ভ্রমণ নিয়ে লিখেছেন *চীনে ভারতীয় মেডিকেল মিশন* কিংবা *মাও চীনে*

আছেন-এর মত অসাধারণ পুস্তকাদি। সম্পাদনা করেছেন বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাশের জীবন কাহিনীর মতো বই।

অমলেন্দু দে-র বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি যেমন নানা অ্যাকাডেমিক জার্নালে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতেন, তেমনি অতি সাধারণ লিটল ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রেও সহজ-সরল কথায় ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গের উপস্থাপনা করতেন যা অত্যন্ত জনপ্রিয় হত। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কিত লেখাগুলি। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ যখন ভেঙে ফেলা হয় এবং ২০০২ সালে গুজরাটের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড চলার এই এক দশক অমলেন্দুবাবু যে কত সভাসমিতি ও সেমিনারে ভাষণ দিয়েছেন ও লেখালেখি করেছেন তা সম্পূর্ণ জড়ো করলে একটা বড় সংকলন হয়ে যেতে পারে। কত লেখকের কত বইয়ের যে তিনি মুখবন্ধ রচনা করে দিতেন তার হিসেব রাখা মুশকিল। জীবনতারা হালদারের রচিত *অনুশীলন সমিতির ইতিহাস* বা স্যার আজিজুল হকের দুষ্প্রাপ্য ও কিংবদন্তীতুল্য গ্রন্থ *Man Behind the Plough* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত অর্থেই অধ্যাপক অমলেন্দু দে হয়ে উঠেছিলেন সর্বজনের ঐতিহাসিক।

জাপানে, চীনে, পশ্চিম জার্মানি ও বাংলাদেশে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে গেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস-প্রেমী সকল স্তরে অধ্যাপক অমলেন্দু দে-র নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিত হয়। আচার্য যদুনাথ সরকার স্মরণে তাঁর জীবন ও রচনাপঞ্জী সংকলন তাঁর আর একটি বড় কাজ। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে ও পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের আধুনিক ভারতীয় শাখায় তিনি সভাপতিত্ব (১৯৮৯) করেছিলেন। তাছাড়া যুক্ত ছিলেন বহু গবেষণা সংস্থা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলির সঙ্গে। এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতাতে দীর্ঘকাল নানা সময়ে (১৯৭৯-২০০১) সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতি ও সভাপতি পদে দায়িত্বভার সামলেছেন। এছাড়া অধ্যাপক এস পি সেন প্রতিষ্ঠিত Institute of Historical Studies, Calcutta এবং Calcutta Historical Society-র পরিচালন সমিতিতে তিনি ছিলেন।

গত ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিনটিতে (১৬মে ২০১৪) যখন তাঁর মরদেহ আরজিকর হাসপাতালের অ্যানাটমি বিভাগে দান করার জন্য নিয়ে আসা হল তখন গুটি কয়েকমাত্র অনুগামী এবং একটি মাত্র সংবাদপত্রের সাংবাদিক-ফটোগ্রাফার (সর্বমোট জনা দশেক) ছাড়া আর কেউই উপস্থিত ছিলেন না! যেদিন তিনি চিরতরে চোখ বুজলেন, সেদিনই ভারতবর্ষের রাজপাটে আসীন হল এক সাম্প্রদায়িক শক্তি, যার বিরুদ্ধে অধ্যাপক অমলেন্দু দে-র সর্বাত্মক সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন আজীবন। আশা রাখি তাঁর সমগ্র জীবনের সংগ্রাম কোনো এক ব্যক্তির না হয়ে সমগ্র ভারতীয় মহাদেশের প্রায় এক শতাব্দীর আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিবৃত্তের অংশ হয়ে চিরকাল স্মরণযোগ্য হয়ে থাকবে।

সুনীতি কুমার ঘোষ

৩৩ পৃষ্ঠার পর

যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরাই তাঁর মধুর এবং আপন করে নেওয়া ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে তাই শোকস্তব্ধ হয়েছেন ঢাকা শহরের বিপ্লবীরা, দিল্লী, পাটনা, উত্তরপ্রদেশের মানুষ থেকে সুদূর-আলাস্কা-প্রবাসী অধ্যাপক এবং কানাডার ভারতীয় অভিবাসীবৃন্দ। শোকবার্তা এসেছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। প্রয়াণলেখ প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি।

যে অভিজ্ঞতার আকর ছিলেন সুনীতি ঘোষের মতো মানুষরা, তঁদের মৃত্যুতে বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষতির হিসেব কষতে গেলে কোনো পরিমাণ জ্ঞাপক বিশেষণই যথাযথ নয়। রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ সমাসন্ন, নকশালবাড়ির আন্দোলনও অর্ধশতক ছুঁতে চলেছে। এমন এক সন্ধিক্ষণে বড় প্রয়োজনীয় ছিলেন সুনীতি ঘোষ আর তাঁর প্রজন্মের সংগ্রামী মানুষরা।

সুনীতি কুমার ঘোষ-এর বই

- বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি রাজনীতি (২০০১)
- ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) : একটি পর্যালোচনা (২০০৪)
- The Indian Big Bourgeoise : Its Genesis, Growth and Character (1999)
- India and the Raj (1919-1947) : Glory, Shame and Bondage ,Vol. I (1989), Vol.II (1995)
- India's Nationality Problem and the Ruling Classes (1996)
- Imperialism's Tightening Grip over Indian Agriculture (1998)
- The Indian Constitution and Its Review (2001)
- Development Planning in India; Lumpen-development and Imperialism (2002)
- Himalayan Adventure : India-China War of 1962 : Causes and Consequences (2002)
- Naxalbari Before and After : Reminissences and Appraisal (2009)

সম্পাদিত গ্রন্থ

- The Historical Turning-point : A *Liberation* Anthology (2 vols) (1992, 1993)

স্মরণ

নির্মলদাকে নিয়ে কথা একটা সময়ের কথা

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

নির্মলদা, নির্মল চন্দ্র চলে গেলেন ১৯ মার্চ, ২০১৪। নির্মলদাকে নিয়ে আমার বন্ধু সুশীল (খান্না) আর আমার শিক্ষক অমিয়দা (অমিয় বাগচি) দুটি লেখা লিখেছেন *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি* পত্রিকায়। লেখা দুটি পড়ে ফেললাম। লেখা দুটিতে এমন সব কথা রয়েছে আমাদের ফেলে আসা, বয়ে নিয়ে চলা একটা সময়ের কথা মনে করিয়ে দিল। সেই কথা বলতে জানতে ইচ্ছে হলো। তাই এই লেখাটা। অনীকের পাতায় ছাপা হওয়ার ইচ্ছেয় লেখাটা।

লেখাটির একটি বিপদ আছে। সেটা খেয়াল করে আগে থেকে বলে কয়ে নিয়ে ক্ষমা চেয়ে রাখা। বিপদটি এইরকম, খানিকটা ব্যক্তিগত কথা, 'আমি' নিয়ে কথা চলে আসবে লেখাটায় প্রয়োজনে। 'আমি'-কে জাহির করার জন্য নয়। লেখার বিষয়ে, সময়ের দরকারে। আমার বয়ানে ব্যক্তি, সময়, বিষয়, রাজনীতি, জ্ঞানচর্চার একটা কথকতা।

শুরুটা এইভাবে করি। বন্ধুদের উদ্যোগে আমি একটি অস্থায়ী চাকরি পেলাম। ফ্যাক্ট ফাইনডিং কমিশন অন নিউজপেপার ইকনমিক্স। ভারত সরকারের ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং মিনিস্ট্রি কমিশনটি বানায়। চেয়ারম্যান অর্থনীতির শিক্ষক ভবতোষ দত্ত। আমার পদ রিসার্চ অফিসার টু দি চেয়ারম্যান। তখন ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকাল। তিনি চেয়েছিলেন সংবাদপত্রদের নিয়ন্ত্রণ করতে। করতে গেলে, যাদের নিয়ন্ত্রণ করতে চাওয়া, তাদের সম্বন্ধে জানতে হবে। ইন্দিরা গান্ধীর বোধহয় সবটা জানা ছিল না। তাই জানতে চাইলেন এই কমিশনটি বানিয়ে। এটা ঘোষিত নয়, আমার মনে হওয়া। ভবতোষবাবুর রিসার্চ অফিসার হয়ে আমার কাজ হলো সংবাদপত্র বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান, সংগ্রহ, সাজানো। সাজিয়ে তাঁকে দেওয়া। একবছর পর একটা মোটাসোটা রিপোর্ট বানিয়ে সরকারকে জমা দেওয়া হয়েছিল। তা নিয়ে সরকার কী করেছিল মনে নেই।

এখন কয়েকটি কথা মনে পড়ে। কমিশনের মত ছিল, যেহেতু একটি কাগজ একজন পাঠক-ক্রেতা দাম দিয়ে কেনেন, তার একটা অধিকার থাকে। নির্দিষ্ট পরিমাণে খবর পাওয়ার অধিকার। তাই প্রস্তাব ছিল বোধহয় ৭০ শতাংশ খবর, ৩০ শতাংশ বিজ্ঞাপন। এখনকার খবরের কাগজগুলো দেখে সেই কথাটা মনে পড়লো।

আর একটা অন্য কথাও মনে পড়ছে। আমাকে, আমাদেরকে পত্রিকার দপ্তরগুলোতে যেতে হত তথ্য সংগ্রহে, প্রশ্ন উত্তরে। ওরা প্রচুর ভালো ভালো খাবার দিতেন। কখনও উপহার। ভবতোষবাবুর নির্দেশ ছিল চা, কফি, বিস্কুট-এর বাইরে কিছু খাওয়া চলবে না। উপহার নেওয়া যাবে না। মাঝে মাঝে কোনও কোনও পত্রিকা কমিশনের সম্মানে পার্টি দিত। আমাদের যাওয়া বারণ ছিল। সরকারের বারণ নয়, ভবতোষবাবুর বারণ।

কমিশনের কাজে মাঝে মাঝে দিল্লিতে থাকতে হতো। থাকার জায়গা এবং কাজের জায়গার দূরত্ব হেঁটে আধ ঘণ্টা। ভবতোষবাবুকে 'স্যার' ডাকতাম। স্যারের সঙ্গে দিনে বার তিনেক এই পথটা হাঁটতে হতো। সকালে অফিসে যাওয়া, দুপুরে অফিস থেকে থাকার জায়গায় খেতে আসা। আবার খেয়ে অফিসে ফিরে আসা। স্যার হাঁটতে হাঁটতে আমাকে পড়াতেন, না-পড়ানোর ভান করে। ভারতের অর্থনীতির, আর্থনীতিক ইতিহাসের, অর্থনীতির রাজনীতি, রাজনীতিক অর্থনীতির একটা কঠিন পাঠ হয়ে যেত সহজতায়। স্যার জানতে পারতেন না আমি মনে মনে মিলিয়ে নিতাম, ভেঙে-চুরে সাজিয়ে নিতাম, নকশালবাড়ি আন্দোলনে তোলা তর্কের বিষয়গুলো, অর্থনীতি নিয়ে তোলা তর্কের বিষয়গুলো।

কমিশন শেষ হবার মাসখানেক আগে স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি এরপর কী করবো? লজ্জার মাথা খেয়ে বললাম, আমার একটা চাকরি করা দরকার। তখন আমাদের বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। স্যার জানালেন, আমার এখনকার কাজের সূত্রে পরিচিত একজন, যিনি একটি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান, আমাকে সেখানে চাকরি দিতে চান। আমি বললাম, আপনি যা বলবেন। স্যার একটি ছোট্ট বাক্য রচনা করলেন, 'আসলে ওদের টাকাপয়সার সূত্র নিয়ে কথাবার্তা ওঠে'। আমার কাছে ইঙ্গিতটি যথেষ্ট। আমি ঘাড় নাড়লাম, ঠিক আছে স্যার। স্যারের গম্ভীর নির্দেশ, 'তুমি এখন গবেষণায় থাকো'। আমি নাথা নাড়লাম, 'না স্যার, আমার একটা চাকরি করা দরকার। তাছাড়া আমি গবেষণা করার মতো যোগ্য ছাত্র নই। আমাকে কেউ গবেষণায় নেবেন না।' 'আমি অমিয়কে বলেছি, তুমি ওর কাছে কাজ করো। অল্প কিছু টাকা পাবে। তোমার চলে যাবে।' স্যার এমনভাবে কথা বলতেন বিরোধিতা করা যেত না। তাছাড়া আমার সন্দেহ ছিল, অমিয়কুমার বাগচি, তখন নামজাদা অধ্যাপক, আমার মতো অতি সাধারণ ছাত্রকে নেবেন কেন?

ভবতোষ দত্ত অমিয় বাগচির শিক্ষক। সম্ভবত তাঁর আদেশেই আমি অমিয় বাগচির গবেষক ছাত্র হয়ে গেলাম। সামান্য বৃত্তিতে। সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোসাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটা।

অমিয় বাগচি, অমিয়দার বন্ধু নির্মল চন্দ্র, নির্মলদা।

অমিয়দার সঙ্গে কাজ করতে করতে নির্মলদার সাথে পরিচয়। পরে সেই পরিচিতি বেড়ে যায় যখন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, ক্যালকাটায় রিসার্চ ফেলো হয়ে চলে যাই। নির্মলদা তখন সেখানে।

নির্মলদা, অমিয়দা অর্থনীতির ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, আলোচক, লেখক, গবেষক শিক্ষক। এই দুজনের কাছেই আমার অনেক কিছু জানা, বোঝা, দেখা। একটু বললেই সবটা বলা হবে না। বাকিটা বলার জন্য সময়টাকে জানতে হবে।

তখন নকশালবাড়ির আন্দোলন কয়েকটি আর্থনীতিক বিষয়কে, ঠিকঠাক বললে রাজনীতিক আর্থনীতিক বিষয়কে বা এভাবে বলা যায় কি না, আর্থনীতিক রাজনীতিক বিষয়কে, বিষয় ঘিরে তর্ককে, সামনে নিয়ে এসেছে। বয়সের কারণে আমার স্মৃতির সাথে বন্ধুতা কমে আসছে। যতটুকু মনে পড়বে বলবো। ভুল হলে তা ইচ্ছাকৃত নয় বা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক নয়— এটা স্বীকার রইল। আগাম মার্জনা চেয়ে নেওয়া থাকল।

যে প্রশ্নগুলো সামনে নিয়ে এলো— ভারতীয় বুর্জোয়ারা কি স্বাধীন নাকি বিদেশনির্ভর, পরাধীন। ভারতের কৃষি কি সামন্ততান্ত্রিক কিংবা আধা সামন্ততান্ত্রিক অথবা পুঁজিবাদী। সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনা কি সমাজবাদী নাকি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী। এই কটি সামনে আনার এই মুহূর্তের কারণ, এই বিষয়গুলির সঙ্গে নির্মলদা, অমিয়দা জড়িয়ে ছিলেন। আমরাও জড়িয়ে ছিলাম।

আমার পিএইচডি গবেষণার বিষয় ঠিক হলো আমার গবেষক-শিক্ষক অমিয়দার সাথে আলোচনার করে। ফরেন ক্যাপিটাল অ্যান্ড টেকনোলজি ইন ইন্ডিয়ান বিজনেস হাউসেস ১৯৫০-১৯৭০। তখন ভারতীয় পুঁজি বলতে বোঝাতো 'বিজনেস হাউস' গুলিকে। যেমন টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, শ্রীরাম ইত্যাদি। একটা বিজনেস হাউসের আওতায় থাকত অনেক সংস্থা, উৎপাদন সংস্থা, ব্যবসা সংস্থা, পরিষেবা সংস্থা ইত্যাদি। সবটা মিলিয়ে একজন, এক পরিবার অন্তর্গত পুঁজিপতিদের ধরা। পুঁজিপতি শ্রেণীকে বোঝা। যাদেরকে আবার সরকারি ভাষায় 'মনোপলি ক্যাপিটাল', একচেটিয়া পুঁজি, অন্য অন্য লেখাপত্তরে 'বিগ হাউসেস' বলা হতো।

নির্মলদার, অমিয়দার তখন কাজের, ভাবনার বিষয় পুঁজিপতি শ্রেণী, একচেটিয়া পুঁজি, ভারতে শিল্পায়নের ধারা। গবেষণার কাজ শুরু করেছিলাম সেন্টার ফর স্টাডি ইন সোসাল সায়েন্স-এ। যেখানে অমিয়দা। শেষ করেছিলাম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ক্যালকাটায়। সেখানে নির্মলদা।

অমিয়দা খুব কঠিন গবেষক শিক্ষক। প্রচুর খাটাতেন। ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না। দিল্লিতেই বেশিরভাগ সময় কাটাতে হতো। তখন ভারতের শিল্পে অর্থনীতিতে, বড়ো পুঁজিপতিদের আধিপত্য নিয়ে আর কে হাজারি কমিটির এবং সুবিমল দত্ত কমিটির প্রতিবেদন বেরিয়ে গেছে। দত্ত কমিটির সমস্ত কাগজপত্র ছিল দিল্লির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধ্যাপক আর কে গোয়েলের কাছে। অধ্যাপক গোয়েল অমিয়দার বন্ধু। রাজি হলেন আমাকে সব ফাইল দেখতে দিতে। একটাই শর্ত। অগোছালো হয়ে পড়ে থাকা ফাইলগুলো সাজিয়ে দিতে হবে। পাশের একটা কথা সেরে রাখি। অধ্যাপক গোয়েল কমিটির সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে ফাইলগুলো পেয়েছিলেন। সেটা কথা নয়। ফাইলগুলো কাজ শেষ হয়ে যাবার পর ফেলে দেননি, রেখে দিয়েছিলেন। গোয়েল অমিয়দা, নির্মলদার মতো বামপন্থী নন। চন্দ্রশেখরপন্থী। চন্দ্রশেখরকে বলা হতো কংগ্রেস দলের মধ্যে তরুণ তুর্কি। কংগ্রেস সমাজবাদী। যারা তখন ব্যক্তি পুঁজির, সংস্থা পুঁজির ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে।

গোয়েল রেখে দিয়েছিলেন বলে আমার গবেষণার সবচেয়ে মূল্যবান তথ্য পেয়ে গেলাম। একটা ফাইলের মধ্যে একটা পুঁজিপতি গোষ্ঠীর অন্তর্গত একটা সংস্থার বিস্তারিত ইতিহাস। এমন অসংখ্য ফাইল। পুঁজির ইতিহাস। নকশালবাড়ি আন্দোলনে তোলা প্রশ্নের আংশিক উত্তর। এই পুঁজির জন্ম, বেড়ে ওঠা, বিদেশি পুঁজির, প্রযুক্তির ভূমিকা কতটুকু। ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণী কি স্বাধীন না কি বিদেশি পুঁজি, প্রযুক্তি নির্ভর।

প্রথম পর্যায়ে অমিয়দার সাথে, পরবর্তী পর্যায়ে অমিয়দা, নির্মলদার সাথে কথা বলছি, পরামর্শ নিচ্ছি, মত বিনিময় করছি এবং মত পার্থক্য হচ্ছে। অমিয়দা, নির্মলদা পার্থক্য সমাধানে নতুন কাজের জায়গা ধরিয়ে দিচ্ছেন। ভাবনা বানাচ্ছেন, তথ্যকে নানাভাবে বুঝতে, সাজাতে, পড়তে শেখাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট তখনকার আরও দুজন শিক্ষক-গবেষকের কথা বলা দরকার। রনজিৎ সাউ, এন কৃষ্ণাজি, যারা এমনতর তর্ক বিষয়ের অংশীদার। বামপন্থা ভাবনা সাজানোয় অংশগ্রহণকারী। তখন দিল্লিতে একটা ব্যালান্স শিট লাইব্রেরি ছিল। প্রত্যেকটা কোম্পানির ব্যালান্স শিট থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যেত। একটা মজার উদাহরণ দিই। প্রত্যেকটা কোম্পানিকে জানাতে হতো কোন রাজনৈতিক দলকে তারা কত চাঁদা দিয়েছে। তালিকায় বামদলের নাম থাকত।

নানা জায়গা থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে, সাজিয়ে অঙ্ক কষে দেখলাম, নকশালবাড়ির আন্দোলনে যা বলা হয়, ভারতের বুর্জোয়ারা কম্প্রাডর, বিদেশি পুঁজিনির্ভর, তা সবটা ঠিক নয়। 'সবটা' শব্দটা ব্যবহার করার কারণ, ভারতের পুঁজিপতিদের একটা বর্গে রাখাটা ঐতিহাসিক এবং আর্থনীতিক কারণে ঠিক নয়। নানা বর্গে ভাগ করা দরকার। যেমন, আমি দুটো বর্গ বানিয়েছিলাম। যারা পুরনো, বড়ো, যাদের জন্ম ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে যোগাযোগ থেকে, তারা একটা বর্গ। আর যাদের জন্ম সাম্প্রতিক, স্বাধীনতার একটু আগে পড়ে, যারা অতো বড়ো

নয়, তারা একটা বর্গ। আমার কথা অংকে প্রথম বর্গ অতটা বিদেশি পুঁজি, প্রযুক্তি নির্ভর নয়, যতটা দ্বিতীয় বর্গ। প্রথম বর্গ ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত, কংগ্রেস দলের, কংগ্রেস দলের সরকারের মদত পেয়েছে, পুঁজি আর প্রযুক্তির জোর আছে। দ্বিতীয় বর্গ প্রথম বর্গের সঙ্গে প্রতিযোগিতার উপাদান হিসাবে বেছে নিয়েছিল বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে। বিদেশি সহযোগিতাকে, ফরেন কোলাবরেশনকে। আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে অমিয়দা, নির্মলদা পুরোপুরি একমত হলেন না। অমিয়দা নিশ্চিত হতে পাঠালেন বোম্বাইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দপ্তরে তথ্য দেখতে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তখনকার ডেপুটি গভর্নর অমিয়দার বন্ধু। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তখন একটি সমীক্ষা করত। 'ফরেন কোলাবরেশন ইন ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি'। ওরা তথ্য সংগ্রহ করতেন কোম্পানি ধরে ধরে। তথ্য প্রকাশ করতেন সামগ্রিকতায়, কোম্পানি বিশেষে নয়। মাস তিনেকের কাছাকাছি থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অপ্রকাশিত তথ্য ঘেঁটে ঘেঁটে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলো।

সেই সময় নির্মলদা, অমিয়দার ভাবনার, কাজের বিষয়, ভারতের শিল্প ইতিহাস, বিদেশি পুঁজি, বিদেশি সহযোগিতা, ভারতে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, বিদেশি প্রযুক্তির 'সহযোগিতা'। আমার গবেষণার কাজের বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের মিল। আমার মাথায় নকশালবাড়ি আন্দোলনের তর্ক বিষয়। ভারতের বুর্জোয়ারা কি স্বাধীন না পরাধীন, তারা কি বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তি নির্ভর।

আমার সংগ্রহ করা তথ্য, সেই তথ্য সাজানো থেকে নকশালবাড়ির আন্দোলনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, ভারতীয় বুর্জোয়া পরনির্ভরতা, পরাধীনতা, পুরোপুরি প্রমাণিত হচ্ছে না। অমিয়দা বললেন শুধু সংখ্যাতথ্য নিয়ে বলা যাবে না। ইতিহাস দেখতে হবে। নির্মলদারও তাই মত। অমিয়দা পাঠালেন দিল্লিতে। নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরিতে। ভারতের বুর্জোয়াদের লেখাপত্তর পড়তে। নির্মলদা আইআইএম-এর ডিরেক্টরের মাধ্যমে ব্যবস্থা করে দিলেন দিল্লিতে লালা শ্রীরামের আর্কাইভে গিয়ে কাগজপত্র দেখতে। দুটোই তথ্যের আগার। এক একজন করে শিল্পপতি ধরছি, তাদের চিঠিপত্র পড়ছি। এবং ক্রমশ আমার সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছি। ভারতের বুর্জোয়াদের সবাই বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তি নির্ভর নয়। পরাধীন নয়। কম্প্রাডর নয়।

অমিয়দা অগত্যা আমার গবেষণাপত্রে সই করলেন। মনে মনে মানলেন না। আমিও মনে মনে মানিনি। কারণ এই গবেষণার সিদ্ধান্ত নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রকাশিত বক্তব্যের বিপরীত। অমিয়দার মত, আমার গবেষণার সময়কাল ১৯৫০-৭০-এর পর ভারতীয় পুঁজির বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তি নির্ভরতা বেড়ে গেছে। আর এখনকার অর্থনীতিতে তার সমর্থনও পাওয়া যাচ্ছে।

তখন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে রণজিৎ সাউ একটি মাসিক আলোচনা সভার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। একটি সভায় আমার গবেষণার একটি অধ্যায় পাঠ করি। তর্ক হয়। নির্মলদা তর্কে আমার পাশে ছিলেন।

বিষয়টা নিয়ে নির্মলদা, অমিয়দা আরও এগোতে চেয়েছিলেন। ভারতের অর্থনীতিতে, শিল্পে, পরিষেবায়, সরকারি সংস্থায়, ভারতীয় বেসরকারি সংস্থায় বিদেশি পুঁজি আর প্রযুক্তির 'অনুপ্রবেশ'। ভারতীয় গবেষণা সংস্থায় দেশীয় প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রযুক্তির প্রয়োগ। বহুজাতিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক ঋণ সংস্থা। ভারতীয় রাষ্ট্রের 'আর্থনীতিক স্বাধীনতা'। নকশালবাড়ি আন্দোলনের তর্ক বিষয়ের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে। এদের দুজনের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল একদল ছাত্র, এক একটি ক্ষেত্র ধরে। নির্মলদার সঙ্গে সুদীপ (চৌধুরী), সুশীল (খান্না), বার্নাড (ডিমেলো)। অমিয়দার সঙ্গে আমি, উত্তম (ভট্টাচার্য)। আর একটু বাড়িয়ে নির্মলদা, অমিয়দার বন্ধু দিল্লিতে জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রভাত পট্টনায়কের সঙ্গে বিশ্বজিৎ (ধর)। কাজের জায়গা ভাগ হলো এইভাবে—সুদীপ ফার্মাসিউটিক্যাল, সুশীল পেট্রোকেমিক্যাল, বার্নাড স্টিল, আমি ইলেকট্রিকাল ইকুইপমেন্ট, উত্তম মেশিনটুলস্, বিশ্বজিৎ ফার্টিলাইজার। প্রশ্ন মোটামুটি এক। তাই একসঙ্গে আলোচনা, সমস্যা কথা, সমাধান সন্ধান। নির্মলদা, অমিয়দার পরামর্শে, মতামতে। আমরা স্বপ্ন দেখতাম, আমরা একটা স্কুল হিসাবে গড়ে উঠবো। জানতাম ইউরোপের কোন একটা দেশে (এতদিনে নামটা মনে নেই) একটা সংস্থা ছিল ট্রান্সন্যাশনাল স্টাডি সেন্টার (নামটা বোধহয় ঠিক বললাম)। সেখানে একদল গবেষক একসঙ্গে থাকে, একসঙ্গে কাজ করে, আলোচনা করে, লেখে, প্রকাশ করে। আমরাও সে রকম করবো।

এর পাশে একটা জরুরি কথা বলে ফেলতে হবে। তখন 'অন্য অর্থ' বেরচ্ছে। বাংলা কাগজ। একটা ছোট, বড়ো লেখা নিয়ে *অন্য অর্থ*। অন্যটি ছোট ছোট লেখা নিয়ে পাক্ষিক *অন্য অর্থ*। অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, রাজনীতি শাস্ত্রের ছাত্রছাত্রী, গবেষক, শিক্ষকদের পত্রিকা, পত্রিকা নিয়ে সংগঠন। *অন্য অর্থ*-এর আলোচনায়, লেখায়, সমীক্ষায়, নানা বিষয়ের মধ্যে চলে এসেছিল নকশালবাড়ি আন্দোলনের বিষয়তর্ক। ভারতের কৃষির চরিত্র, বিদেশি পুঁজির ভূমিকা, বিদেশ সংস্থার দেশীয় রাজনীতিতে প্রভাব, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, চীন দেশের কৃষি ভাবনা ইত্যাদি। নির্মলদা, অমিয়দার পত্রিকা *নাও*, *ফ্রন্টিয়ার*। ওদের বন্ধু পত্রিকা সম্পাদক *সমর সেন*।

অন্য অর্থ যেমন অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, রাজনীতি শাস্ত্রের ছাত্র, গবেষকদের পত্রিকা, ঠিক তেমনই একই ভাবনার শরিক, বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের, গবেষকদের পত্রিকা 'বিজ্ঞান ও

বিজ্ঞানকর্মী'। এটা বলার কারণ একটা উদাহরণ জানানো। তখন এমনই হতো, এটা বলার জন্য। নির্মলদা, অমিয়দার কাজের বিষয়ের মধ্যে একটি, ভারতের গবেষণাগারগুলিতে ভারতীয় গবেষকদের গবেষণার বিষয়, গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সেই প্রযুক্তির প্রয়োগ।

অমিয়দা খুঁজে পেলেন এন কে চক্রবর্তীকে (নামটা সম্ভবত ঠিক বলছি। এতদিন বাদে ভুল হতে পারে)। রসায়নশাস্ত্রের গবেষক। সার উৎপাদন তখন সরকারি ক্ষেত্রে। সরকারি সার উৎপাদন সংস্থার সঙ্গে জুড়ে সরকারি সার গবেষণা সংস্থা। তার দায়িত্বে এন কে চক্রবর্তী। ওনার সঙ্গে প্রায় একশোর মতো তরুণ গবেষক, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্, প্রকৌশলী। দেশের কৃষির উন্নতির জন্য দেশের সরকারি সার উৎপাদন সংস্থা। দেশের ভিতরে নিজেরাই সার উৎপাদনে, দেশের ভিতরেই নিজেদের সার উৎপাদন প্রযুক্তির জন্য, নিজেদেরই গবেষণা সংস্থা। অমিয়দা আমাকে পাঠালেন তথ্য সংগ্রহে। সঙ্গী হলো আমার বন্ধু অভিজিৎ। পদার্থবিদ্যার ছাত্র, গবেষক, শিক্ষক অভিজিৎ লাহিড়ী। অভিজিৎ তখন *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*-তে। *অন্য অর্থ* আর *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* মিলে এক সাথে কাজ করা, জানার কাজ।

সুযোগ যখন পাওয়া গেল, তখন এ বিষয়ে কয়েকটা কথা বলে নিই। সার গবেষণা কেন্দ্রের কর্মীরা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছিলেন। নানা ছলছুতোয় সার মন্ত্রকের আমলারা তা স্বীকার করেনি। গ্রহণ করেনি। প্রয়োগ করেনি। সে অন্য এক কাহিনী। ভারতের সার উৎপাদন আস্তে আস্তে বিদেশি প্রযুক্তি, বিদেশি পণ্য, বিদেশি উৎপাদন সংস্থার সঙ্গে প্রযুক্তি ও উৎপাদন সহযোগিতা, বিদেশি উৎপাদন সংস্থা ঢুকে পড়ে। আজ আমরা যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এফডিআই, বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে প্রতিবাদ করি, তার শুরু সার দিয়ে।

একটু পিছনে ফিরে যাই। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিশন অন নিউজপেপার ইকনমিক্স-এ কাজ করার সময় ভবতোষবাবুর সঙ্গে হাঁটার কথা, হাঁটার সময় স্যারের সাথে ভারতীয় অর্থনীতি পাঠের কথা আগে বলেছি। স্যারের কাছে দুটি কমিটি এবং কমিটি রিপোর্টের কথা শুনেছিলাম। পরে গবেষণার প্রয়োজনে দেখতে হয়েছে, রিপোর্ট অফ দি কমিটি অন পাবলিক আন্ডারটেকিংস এবং এস্টিমেট কমিটি রিপোর্ট। অনেকদিন আগের কথা। সম্ভবত নাম দুটো ঠিকঠাক বললাম। দুটোই পার্লামেন্টের কমিটি। কমিটির সদস্যরা পার্লামেন্টের সদস্য, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, এমপি। কমিটি অন পাবলিক আন্ডারটেকিং দেখত সরকারি সংস্থাদের অবস্থা। এক একটি সরকারি সংস্থার অবস্থা আলাদা আলাদা করে। আলাদা আলাদা রিপোর্ট। তেমনি এস্টিমেট কমিটি এক একটি মন্ত্রকের জন্য। এই দুটি কমিটির অবাধ ক্ষমতা ছিল। সদস্যরা চাইলে সংস্থারা, মন্ত্রকরা, তাদের সমস্ত তথ্য দিতে, ফাইল দেখাতে, প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য থাকতো। স্যার বোঝাতেন কী ভাবে এক একটি সংস্থার প্রধানরা, একটি সরকারি সংস্থায়, সরকারি গবেষণা সংস্থায় বানানো প্রযুক্তি প্রয়োগে বাধা দিয়েছে, বিদেশি প্রযুক্তির হয়ে ওকালতি করেছে, বিদেশি যন্ত্র কেনার সুপারিশ করেছে, বিদেশি সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তির পক্ষে মত দিয়েছে। এবং তা কাজেও লাগিয়েছে। কমিটির রিপোর্টে এমন সব তথ্য থাকতো। স্যার বলেছিলেন, রিপোর্টে যতটুকু পাও, তা যোগাড় করা তথ্যের ২০ শতাংশ, ৮০ শতাংশ লেখার বাইরে থাকে। অমিয়দা আমায় কাজ দিয়েছিলেন ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে। তাপ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনে যে যন্ত্রপাতি লাগত তার উৎপাদন ও প্রযুক্তি নিয়ে। রিপোর্টগুলো ধারাবাহিক পড়ে দেখতে পেতাম কীভাবে আস্তে আস্তে স্বদেশি সংস্থা, স্বদেশি উৎপাদন, স্বদেশি প্রযুক্তিকে সরিয়ে দিয়ে বিদেশি প্রযুক্তি, বিদেশি পণ্য, বিদেশি সংস্থাকে জায়গা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলোচনা হতো নির্মলদা, অমিয়দার সঙ্গে।

আরও একটা সূত্রে এই প্রক্রিয়াটা দেখতে পেয়েছিলাম। অমিয়দা, নির্মলদার একজন বন্ধু তখন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রকের সচিব। অমিয়দার উদ্যোগে তার ঘরে বসে ভারতীয় সংস্থায় বিদেশি সহযোগিতার চুক্তি এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া বিষয়ক ফাইল দেখতাম। একটাই শর্ত ছিল, তথ্য উল্লেখ করতে পারবো না।

লেখাটা অনেকটা ছড়িয়ে ফেলেছি। এবার গুটিয়ে আনি। নির্মলদার কাছে, অমিয়দার কাছে তখন অর্থনীতি নিছক অর্থনীতি নয়। বিশুদ্ধ অর্থনীতি নয়। অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি, রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতি জড়িয়ে। নির্মলদাদের কাছে বামপন্থা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, মার্কসীয় অর্থনীতি। তার নানা উপকরণ।

আমাদের কাছে নকশালবাড়ি আন্দোলন, আন্দোলনের তর্কবিষয়, অর্থনীতির বিষয়, অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা রাজনীতি, রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অর্থনীতি। অর্থনীতি নিয়ে নিজের গবেষণার সঙ্গে নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাস, ধারণা, তত্ত্বকে মিলিয়ে নেওয়া, নিজের কাজের সঙ্গে, ভাবনার সঙ্গে সহযাত্রীদের কাজ ও ভাবনা থেকে সাহায্য নেওয়া। একটা ভাবনা-গোষ্ঠী হিসাবে গড়ে ওঠার স্বপ্ন দেখা। আর সেই প্রক্রিয়ায় আমাদের পূর্ব প্রজন্মকে পাশে পাওয়া। যেখানে নির্মলদা। এই লেখাটা নির্মলদার কাছে ঋণ স্বীকার।

আমার বন্ধু সুশীল খান্না আর আমার শিক্ষক অমিয়কুমার বাগচির কাছে কৃতজ্ঞ। তাদের নির্মলচন্দ্রকে নিয়ে দুটি লেখা আমাকে এই লেখাটায় অনুপ্রাণিত করেছে।